সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ২৪ জুন ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ৩৭-৩৮

www.weeklyarafat.com

রয়েল ক্লক টাওয়ার, মক্কাতুল মুকাররামাহ

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ৩৭-৩৮
* বার : সোমবার

◈ ২৪ জুন-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ১০ আষাঢ়-১৪৩১ বঙ্গাব্দ
◈ ১৭ যিলহাজ্জ-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **তাক্বওয়ার সুফল**
    শাইখ মুহাম্মদ ‘আব্দুশ্ শাকূর- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **রাগ মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী এক কু-রিপু**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৯
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **হিজরি সনের ইতিহাস**
    মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন- ১২
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **ঈদ আনন্দ**
    আবূ সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৪
- **:**
  - ❖ **রঈসুল মুফাস্সিরিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)**
    ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ১৬
- **ক্বাসাসুল কুরআন :**
  - ❖ **হারূত-মারূতের কাহিনি**
    আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২০
- **বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস** ২২
- **স্মৃতিচারণ :**
  - ❖ **প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রহিমাহুল্লাহ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ২৬
- **প্রাসঙ্গিক ভাবনা :**
  - ❖ **দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরা : উন্নয়ন ও উন্নয়নের ঝুঁকি**
    মো. আরিফুর রহমান- ২৯
- **মহিলা জগৎ :**
  - ❖ **নারীদের পর্দাহীনতার কারণ**
    এ.টি.এম. আহমাদ- ৩২
- **কিশোর ভুবন :**
  - ❖ **পরমবন্ধু তালগাছ এবং পরোপকারী খোরশেদ আলী**
    মো. কায়ছার আলী- ৩৫
- **কবিতা** ৩৭
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৩৮
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪০
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

হিজরি বর্ষপূর্তি : একটি ভাবনা

হিজরি বর্ষ ১৪৪৫ সমাপ্তির পথে। বর্ষ শুরুর প্রথম মাস মুহার্‌রম। সূচনা মাস মুহার্‌রমের ৯ ও ১০ তারিখে সিয়াম পালনের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। আর চান্দ্রবৎসরের শেষ মাস যিলহাজ্জ। এ মাসকেও সিয়াম, হজ্জ ও কুরবানী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- চান্দ্রমাসের সূচনা ও সমাপ্তিতে বিশেষ 'ইবাদতের বিধান রয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম যে বার্তা দিয়েছে তা হলো– মুসলিম জীবনের আপাদমস্তক স্রষ্টার কানুনের বেষ্টনরেখা কোনোভাবেই অতিক্রম করবে না; বরং তার পূর্ণাঙ্গ জীবন 'ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত হবে। ইসলামে অহেতুক সময় ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নেই। মহান আল্লাহর আদালতে সময়ের হিসাব দিতে হবে। সময় বা আয়ুষ্কাল হচ্ছে পরকালের সফল বাণিজ্যের পুঁজি বা মূলধন। বছরের সূচনাতে মূলধনকে কাজে লাগানোর প্রতি ইঙ্গিত করে বোঝানো হয়েছে –যেন কোনো সচেতন মুসলিম অহেতুক সময় নষ্ট না করে। আর শেষে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ সম্পাদনের বিধান প্রবর্তন করে তাওহীদের ঘোষণা চূড়ান্তকরণের প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যদি একজন মুসলিম মহান আল্লাহর নির্দেশনা মেনে রাসূল (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করে, তাহলে তার মূলধন সুরক্ষিত থাকবে এবং পরকালে চূড়ান্ত বিজয়ী হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যে বা যারা আত্মভোলা হয়ে, গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলবে, সময়কে মূল্যায়ন করবে না; বরং উদাসীনতার পরিচয় দেবে, সে সর্বস্বান্ত হবে। আর তার ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার।

বর্ষবরণ কিংবা বিদায় অনুষ্ঠান ইসলামে নেই। কেননা, তাতে অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ হয়। আর এরূপ অপসংস্কৃতির তাকলীদ দেউলিয়াপনা শিক্ষা দেয়। এজন্য ইসলাম এসব আনুষ্ঠানিকতাকে নব্য জাহিলিয়াত বলে আখ্যা দিয়েছে। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অজ্ঞ জাহেলদের পথ অনুসরণ করা হতে বিমুখ থাকো"।

বর্তমান এ সভ্য সমাজে অপসংস্কৃতির চর্চা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৈতিকতা ও মনুষত্ব আজ উপেক্ষিত। সর্বত্রই যেন অন্যায়-অবিচার ও পাশবিকতার সয়লাব। "কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই" –এ প্রবচনের কুহেলিকায় গড়ে ওঠছে আমাদের প্রজন্ম। সনদ আছে, শিক্ষা নেই। মানুষ আছে, মনুষত্ব নেই। নীতি আছে, বাস্তবায়ন নেই। আদর্শের বুলি আছে, নৈতিকতার বালাই নেই। এ যেন অরাজকতার অভয়ারণ্য।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে সর্বপ্রকার অপসংস্কৃতির সবটুকু বর্জন করতে হবে। নৈতিক গুণসম্পন্ন আদর্শ শিক্ষার আলোয় জাতি গঠন করতে হবে। তাদেরকে সময়ের মূল্য কী তা হাতে কলমে শিখিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সময়ের কসম করে বলেন, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত! তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, গ্রহণযোগ্য 'আমল করেছে, পরস্পরে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং সবর ইখতিয়ারের ওয়াসীয়াত করেছে। আমরা বাস্তবতার নিরিখে দেখতে পাই যে, দুনিয়ায় তারাই সফল হয়েছে, যারা সময়ের মূল্য দিয়েছে, জীবনকে একটি নিয়মের মধ্যে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ সবের শিক্ষা রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ প্রদত্ত এ দ্বীনের যথাযথ অনুসরণই পারে– মানুষকে সুশৃংখল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে। প্রারম্ভিকায় বলা হয়েছে– মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদের যথাযথ স্বীকৃতি ও তার দাবিসমূহ বাস্তবায়নই 'ইবাদত বা বন্দেগীর মূল রহস্য, আর ইসলামে 'ইবাদত ছাড়া মৌলিক কোনো বিষয় নেই। তাই আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ, সময়, শ্রমকে একটি পরিপূর্ণ রুটিনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন সফলতার চালিকা শক্তি হতে পারে।

অতএব বছরের সূচনা কখন হলো এবং কখন সমাপ্তি ঘটল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং এখন এই মুহূর্ত থেকেই আমাকে স্রষ্টার পানে প্রত্যাবর্তন করতে হবে; সময়ের যথার্থ ব্যবহার করে ইহকালীন সমৃদ্ধির পাশাপাশি পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে– আর এখানেই রয়েছে মানব জীবনের স্বার্থকতা। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

তাক্বওয়ার সুফল

–শাইখ মুহাম্মদ ‘আব্দুশ্ শাকূর★

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত। আর প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।”[১]

সূরার নামকরণ

সূরা আ-লি ‘ইমরান কুরআন মাজীদের ৩য় সূরা। সূরাটিতে আ-লি ‘ইমরান অর্থাৎ- ‘ইমরানের বংশধরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র সূরার ৩৩ নং আয়াতে ﴿وَاٰلِ عِمْرَانَ﴾ (ওয়া আ-লি ‘ইমরান) শব্দ থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাটির পরিচিতির জন্য এ নামে নামকরণ করা সার্থকতা ভেবেই নামকরণ হয়েছে। নামকরণের ব্যাপারে অন্যান্য সূরার ন্যায় এই সূরাটির নামকরণেও ওয়াহীর নির্দেশ রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজস্ব কোনো চিন্তা থেকে সূরার নামকরণ করেন না।

নাযিলের কারণ ও সময়কাল

আলোচ্য সূরাটি সর্বসম্মত মতানুযায়ী মাদানী সূরা। সূরাটি এক সাথে নাযিল না হয়ে সময়ের প্রয়োজনে মোট চারটি ভাষণে সূরাটি নাযিল হয়েছে। নবী কারীম (ﷺ)-এর উপর নাযিলকৃত মাদানী সূরাসমূহের মধ্যে অত্র সূরাটি অন্যতম। যেহেতু সূরাটিতে দু’টি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে। একটি দল হলো– আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান), অপর দলটি হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসারী সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান। এ সময় কাফির-মুশরিকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের শক্তির প্রয়োজন সময়ের নিরিখে এমনই একটি সূরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফলে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাদানী জিন্দেগীতেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য

মুসলমানদের ঈমানী শক্তির উৎস হলো– “তাক্বওয়া”। তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন করা মানেই হলো শক্তিশালী হওয়া। আল্লাহ মুত্তাক্বী-মু’মিনদের বিজয় দিয়ে থাকেন। আর তাক্বওয়া তো মু’মিন-মুসলমান ছাড়া অর্জন করতে পারে না। ঈমান আনলে পরে ঈমানের দাবিই হলো তাকে আল্লাহ-ভীতির নীতি অবলম্বন করতে হবে। ঈমান আনার সাথে সাথে যারা তাক্বওয়ার গুণাবলী অর্জন করবে কেবল তারাই সাচ্চা মুসলমান। আয়াতটিতে এমনই ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। সূরাটির ঐতিহাসিক পটভূমি হচ্ছে–

১. বদর যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেও এ যুদ্ধটি ছিল যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল মারার মতো ব্যাপার। প্রথম দফায় এ সংঘর্ষটি আরবের সেইসব শক্তিগুলোকে আকস্মাৎ নাড়া দিয়েছিল যারা এ নতুন আন্দোলনের ভীষণ শত্রুতা পোষণ করত। এতে চতুর্দিকে প্রচণ্ড ঝড়ের আলামত ফুটে উঠেছিল। মুসলমানদের কলিজায় নিরন্তর ভীতি ও অস্থিরতার অবস্থা বিরাজ করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল মাদীনার এ ক্ষুদ্র জনবসতিকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলা হবে।

২. নবী কারীম (ﷺ) মাদীনার আশ-পাশের ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তারা সে চুক্তির প্রতি সামান্যতমও সম্মান প্রদর্শন করেনি। বদর যুদ্ধের পর তারা কুরাইশ ও আরবদের অন্যান্য গোত্রগুলোকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। বিশেষ করে বানী নাযির সরদার কা‘ব ইবনু আশরাফের বিরোধিতা আর অন্ধ শত্রুতা চরম নিচে নেমে গিয়েছিল।

মাদীনার সাথে এই ইহুদিদের শত শত বছর থেকে যে বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক চলে আসছিল তার কোনো পরওয়াই করেনি। এর ফলে মাদীনার মুনাফিক্ব মুসলমান ও হিজাজের মুশরিক গোত্রগুলোর সাথে চক্রান্ত করে ইসলাম ও সাচ্চা মুসলমানদের জন্য চারদিক থেকে চরম বিপদের সৃষ্টি করে। এমনকি নবীজী (ﷺ)-এর প্রাণ-নাশের জন্য রাত-দিনে সর্বক্ষণ সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে।

★ *সাবেক উপাধ্যক্ষ, বেলদী দারুল হাদীস সিনিয়র মাদ্‌রাসা, নারায়ণগঞ্জ।*

[১] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১০২।*

৩. বদরের পরাজয়ের পর কুরাইশদের মনে এমনিতেই প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল, ইহুদিরা তার ওপর যেন পেট্রোল ছিটিয়ে দিলো। ফলে এক বছর পরই মাক্কা থেকে তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের একটি দল মাদীনা আক্রমন করল। এ যুদ্ধ হলো উহূদ পাহাড়ের পাদ দেশে। যা ইসলামের ইতিহাসে উহূদ যুদ্ধ নামেই প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নবীজির সাথে এক হাজার লোক বের হয়েছিল। কিন্তু পথিমধ্যে কপাল পোড়া তিনশ' মুনাফিক্ব হঠাৎ আলাদা হয়ে মাদীনার দিকে ফিরে এলো।

৪. উহূদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় যদিও মুনাফিক্বদের কৌশলের একটি বড় অংশ ছিল তবুও মুসলমানদের নিজেদের দুর্বলতার অংশও কম ছিল না। উল্লিখিত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যেমন ভয় করা উচিত। আর প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[২]

আর ঈমান হলো মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং তাওয়াক্কুলের বাস্তব নমুনা। ঈমান আনার সাথে সাথে সেই ঈমানের ওপর টিকে থাকার মানসিক প্রস্তুতিই একজন মু'মিনকে প্রকৃত ঈমানদার হতে সাহায্য করে। কারণ মানুষের মানষিক ভিত্তি রচিত হয় ঈমানের দ্বারা।

ঈমানদার যখন মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তখন তাকে বলা হয়– মু'মিন। মুসলমান হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো 'আমল মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তা দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন। যাদের মধ্যে এমন ঈমান আছে তাদেরকেই অত্র আয়াতে ঈমানদার বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারকে বলছেন : "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো"। ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "আল্লাহকে ভয় করো আর পাপাচার থেকে বেঁচে থাকো"।

কারণ ﴿اتَّقُوا﴾ শব্দটির অর্থই হলো বেঁচে থাকা, বিরত থাকা, দূরে থাকা, সর্বোপরি মহান আল্লাহকে ভয় করা। মোদ্দাকথা, আল্লাহভীতি হলো– তাক্বওয়া, আরো সুন্দর ভাষায় বলতে গেলে ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ইসলাম যেসব বিষয় চিন্তা করতে, বলতে ও করতে নিষেধ করেছে, কেবল আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেসব চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম থেকে বিরত থেকে ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করাই হলো তাক্বওয়া। আরো সহজ কথা হলো মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তব জীবন পরিচালনা করার নামই হলো তাক্বওয়া।

তাক্বওয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

আমাদের সমাজে প্রচলিত ধারণা আছে যে, বাহ্যিক বেশভূষা হলো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। আসলে ইসলামের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে ঘুনে ধরা এ সমাজের অধিকাংশের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছে। মূর্খতার কারণে মানুষ মনে করে যার মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে তাসবীহ, গায়ে লম্বা জামা, তিনিই মুত্তাক্বী বা পরহেযগার। প্রকৃত তাক্বওয়া হলো মনে মহান আল্লাহর অস্তিত্বেরভীতি বা ভয় উপস্থিত হওয়া। কারণ তাক্বওয়া থাকলে সে হয় প্রকৃত মুসলমান। মহান আল্লাহর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাক্বওয়া সম্পর্কে বলেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ».

মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর যুল্‌ম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছজ্ঞানও করবে না। তিনি (ﷺ) নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বললেন, তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে, তাক্বওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু। এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম।[৩]

এখানে নবী কারীম (ﷺ) প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় তুলে ধরার সাথে প্রকৃত তাক্বওয়া জানিয়ে দিলেন। অন্তরে তাক্বওয়া থাকলে বাহ্যিক দিকও তাক্বওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে। মহান আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন :

[২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০২।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হাদীস নং- ৩২/২৫৬৪*

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟»، قَالُوْا : بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : «خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُءُوْا، ذُكِرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

আমি কি তোমাদেরকে উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলব? লোকেরা বলল : জ্বি, হ্যাঁ, বলুন, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেন : তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো মানুষ যাদের দেখলে মহান আল্লাহর স্মরণ (অর্থাৎ- অন্তরে তাক্বওয়া থাকলে এর কারণে বাহ্যিক দিকও তাক্বওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)।[৪]

অন্তরে তাক্বওয়ার প্রভাব মানুষকে সম্মানিত করে। প্রত্যেকের দেহের মধ্যে এই অন্তর, দিল কলিজা আছে, এটায় যদি ভালো হয় তাহলে সবই ভালো।

তাক্বওয়ার বাস্তব নমুনা

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবীর সাহাবী উবাই ইবনু ক্বা‘বকে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই! তাক্বওয়া সম্পর্কে আমাকে বলেন! তিনি (ক্বা‘ব) বললেন : হে ‘উমার! আপনি জীবনে এমন রাস্তা দিয়ে হেটেছেন যে রাস্তার দু’ধারে বিষাক্ত কাঁটা, লতা আর রাস্তাটি অত্যন্ত সরু। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : জ্বি। আমার জীবনে এমন একটি রাস্তা অতিক্রম করেছি।

উবাই ইবনু ক্বা‘ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : ভাই ‘উমার! তুমি ঐ রাস্তা কিভাবে অতিক্রম করেছিলে? ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : খুব সাবধানে আমার কাপড়গুলো শরীরের সাথে চেপে ধরে জড়সড় হয়ে খুব ধীরে। যাতে করে আমার কাপড় না ছিঁড়ে যায় আর আমার শরীর যেনো ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। উবাই ইবনু ক্বা‘ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : ভাই! এটাই হলো তাক্বওয়ার উদাহরণ।

চারদিকে অপরাধ আর তাগুতি শক্তি আপনার ঈমানকে ছিঁড়ে ফেলছে, ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে। এর থেকে জীবন বাঁচাতে সাবধানে চলতে হবে। অন্তরে থাকতে হবে মহান আল্লাহর ভয়। আর এই ভয় তৈরি করে দেহের মধ্যে লুক্কায়িত একটি মাংসপিণ্ডে। এটা যদি ভালো থাকে তাহলে ঈমান ভালো হয়ে যায়। আর তাক্বওয়া জীবন্ত হয়। লুক্বমান হাকিমকে তার মনিব ডেকে বলেছিলেন, তোমাকে সবাই বলে তুমি না-কি খুব জ্ঞানী, লুক্বমান বললেন : আমি জ্ঞানী কি-না জানি না। মনিব বলল : দু’টি বকরী ধরে আনো। বক্রীর পালের মধ্য থেকে দু’টি সুস্থ্য-সবল বক্রী আনা হলো। অতঃপর লুক্বমানকে বলা হলো একটি যবাই করে এর মধ্যে দামী বস্তুটি আমার জন্য আনো। লুক্বমান বক্রীর কলিজা নিয়ে মনিবের হাতে তুলে দিলেন। এবার মনিব বলল : দ্বিতীয় বক্রীটি যবাই করে তার মধ্য থেকে নিকৃষ্ট বস্তুটি আমাকে এনে দেখাও।

এবার লুক্বমান দ্বিতীয় বক্রীটিও যবাই করে বক্রীর দিল-কলিজা এনে দিলেন। লুক্বমানের মনিব বলল : তুমি আবার কেমন জ্ঞানী যে, ভালো বস্তুটি চাইলাম তখনও দিল-কলিজা দিলে আবার নিকৃষ্ট বস্তু চাইলাম তখনও দিল-কলিজা দিলে। লুক্বমান বলল : মানব দেহের মধ্যে এটা এইজন্য দামি যে, এটা যদি ভালো থাকে গোটা শরীরটা ভালো থাকে আর এটা যদি খারাপ হয়ে যায় গোটা শরীরটা খারাপ হয়ে যায়। এটা যেমন ভালো থাকলে দামি হয় এটা খারাপ হয়ে গেলে তেমনই নিকৃষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً : إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".

“নিশ্চয়ই দেহের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে। এটা যদি ভালো থাকে গোটা দেহ ভালো থাকে, আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায় গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান! আর তা হলো দিল, কলিজা।”[৫]

তাক্বওয়ার সুফল

যখন কোনো মুসলমানের মধ্যে ঈমান আর জাতীয় শক্তি তাক্বওয়ার সমন্বয় ঘটবে তখনই প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ জাতির কাছে পছন্দ হবে। আর মেহেরবান আল্লাহ তা‘আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ফলে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রহমত এবং বরকত পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন :

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

“মোর যখন কোন জনপদের লোকেরা ঈমান আনে এবং তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন করে তখন আল্লাহ তা‘আলা সেই জনপদের লোকদের জন্য আসমান এবং যমীনের সমস্ত রহমতের দরজা খুলে দেন।”[৬]

আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে আল্লাহ পাক রহমতের দরজা খুলে দেন এবং বান্দার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও ইরশাদ করেন,

---

[৪] *সুনান ইবনু মাজাহ্- মা. শা., হা. ৪১১৯।*

[৫] *বুখারী- মা. শা., হা. ৫২; মুসলিম- মা. শা., হা. ১০৭/১৫৯৯; সুনান ইবনু মাজাহ্- মা. শা., হা. ৩৯৮৪, সহীহ।*

[৬] *সূরা আল আ‘রাফ : ৯৬।*

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

"যারা আল্লাহকে ভয় করে অদৃশ্যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতিবড় সুফল।"[৭]

তাক্বওয়ার পর্যায়

তাক্বওয়ার কতগুলো স্তর বা পর্যায় রয়েছে, যার মধ্যে প্রথম স্তর বা সর্বনিম্ন স্তর কুফ্র ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। আর যারা এমন গুন অর্জন করেছে তাদের প্রত্যেককে মুত্তাক্বী বলা যায়। যদিও সে ছোট-খাটো কিছু গুনাহের মধ্যে জড়িত থাকে। দ্বিতীয় স্তর বা পর্যায় যা আসলে কাম্য, তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের পছন্দনীয় নয়। কুরআন ও হাদীসে তাক্বওয়ার যেসব ফযীলত ও কল্যাণের কথা বলা হয়েছে এ স্তরের তাক্বওয়ার উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তর– নবী-রাসূলগণ এবং যারা তাঁর প্রকৃত অনুসারী তারাই এ স্তরের তাক্বওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ- অন্তকরণকে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের মাধ্যমে অন্তরকে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আর এ স্তরটিই হলো প্রকৃত তাক্বওয়ার হক্ব বা দাবি।

তাক্বওয়ার শক্তি

যতক্ষণ না অন্তকরণে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে ততক্ষণ মুসলমানদের মুক্তি নেই। মুসলমানদের প্রধান শক্তিই হলো তাক্বওয়া। কলিজায় মহান আল্লাহর ভয় থাকলে দুনিয়ার কোনো অপশক্তিকে মুসলমানেরা ভয় করবে না। বিশ্বের মুসলমানদের মুক্তির জন্য একমাত্র উপায় হলো– তাক্বওয়া। আল্লাহ ভীতির নীতি অবলম্বন করলে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন।

অতএব যারা আল্লাহভীতি অন্তরে জায়গা করে দেন তারাই প্রকৃত সফলকাম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে আর তাক্বওয়া অর্জন করে আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারাই সফলকাম।"[৮]

মুত্তাকীদের সাথী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আল্লাহ তা'আলা যাদের সাথী হয়ে যান তাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে হতে পারে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন যারা আল্লাহভীতির নীতি অবলম্বন করে এবং সৎ কাজ করে।"[৯]

মুত্তাকী যারা তাদের অন্তর হলো সুস্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

"কিয়ামতের দিন সম্পদ আর সন্তান কোন কাজে আসবে না, শুধুমাত্র আল্লাহ যাকে সুস্থ অন্তর দিয়েছেন তা কাজে আসবে। অর্থাৎ- শুধু দুনিয়া নয় আখিরাতেও সফল হবে।"[১০]

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾

"তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ।"[১১]

যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের দ্বারা মুসলমানদের শক্তিতে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। কারণ অসুস্থ দিল যাদের তারা হলো মুনাফিক্ব আর মুনাফিক্বদের কাজ হলো মুসলমানদের ঐক্যে ফাঁটল বা চিড় ধরানো। শক্তিতে ফাঁটল সৃষ্টি করা। যেমন- ঘৃন্য অপকর্ম করেছিল মুনাফিক্ব সরদার 'আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই।

মুনাফিক্বি চরিত্র পরিহার করে আল্লাহভীতির নীতি অবলম্বন না করলে তাকে মুসলমান বলা যাবে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

"আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।"[১২]

অর্থাৎ- ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করো। সারা জীবন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, যাতে মৃত্যুও ভয়ের উপরেই হয়। প্রকৃত মুসলমান বলতে পূর্ণভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে– তাক্বওয়ার বহিঃপ্রকাশ হলো মুসলমান/মুত্তাকী মিথ্যা বলবে না, ঘুষ

[৭] *সূরা আল মুল্ক : ১২।*
[৮] *সূরা আন্ নূর : ৫২।*
[৯] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৮।*
[১০] *সূরা আশ্ শু'আরা- : ৮৯।*
[১১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০।*
[১২] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০২।*

খাবে না, ঘুষ দেবে না, যুল্‌ম করবে না, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না, হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, ওজনে কম দেবে না, খাদ্যে ভেজাল দেবে না, সর্বোপরি সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকতে মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে।

মহান আল্লাহর প্রিয় নবী (ﷺ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামের ওপর টিকে থাকার জন্য দু'আ করতেন–

«يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ».

"হে আমাদের অন্তরকে পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল ও স্থির রাখো।"[১৩]

আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি বা তাক্বওয়ার দ্বারা সাফল্য লাভ করতে হলে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রনিধানযোগ্য।

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ﴾

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।"[১৪]

এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথভাবে পালন করে সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার বিবরণ দেয়া যায়। তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে ফারুকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যাতে (উক্ত আয়াতে) চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পার্থক্য ফুটে উঠে। ঘটনাটি এই যে, ফারুকে আযম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদিন মাসজিদে নাববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী-গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল–

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.

এ কথা শুনে 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? সে বলল : আমি মহান আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। পুনরায় 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল : হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদির মুখে কুরআনুল হাকীমের একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, উল্লিখিত এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মাঝে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। রুমী ব্যক্তি ফারুকে আযমকে আয়াতটি শুনালেন এবং এর ব্যাখ্যা তথা তাফসিরও শুনিয়ে দিলেন।...

অতঃপর নব মুসলিম ব্যক্তিটি বললেন যে, **ومن يطع الله** দ্বারা মহান আল্লাহর ফর্‌য কার্যাদির সাথে **ورسوله** দ্বারা রাসূলের সুন্নাতের সাথে, **ويخش** অতীত জীবনের সাথে এবং **ويتقه** ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে।

মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে **فاولئك هم الفا ئزءون**-এর সুসংবাদ দেয়া হবে। বস্তুতঃ **الفائزون** তথা সফলকাম সে ব্যক্তি যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়।

ফারুকে আযম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা শুনে বললেন : রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ সুদূর বিস্তৃত।[১৫]

শিক্ষাসমূহ

১. বাহ্যিক বেশভুশা নাম তাক্বওয়া নয়; প্রকৃত আল্লাহভীতিই তাক্বওয়া।

২. তাক্বওয়ার অনুশীলন মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈরি করে।

৩. পাপ-পঙ্খিল সমাজে অতি সাবধানে চলা এবং ঈমান-'আমলের হিফাজত করা কঠিন চ্যালেঞ্জ।

৪. আত্মশুদ্ধি অর্জন ব্যতীত তাক্বওয়ার সুফল পাওয়া যাবে না।

৫. তাক্বওয়া পরকালের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। আর মুত্তাক্বী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোনো 'আমল কবুল করবেন না।

আসুন! কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত পন্থায় 'আমল করে তাক্বওয়ার অনুশীলন করি এবং এর মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানী শক্তি অর্জন করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ❑

[১৩] *সুনান আত্ তিরমিযী- মা. শা., হা. ২১৪০, সহীহ।*
[১৪] *সূরা আন্ নূর : ৫২।*
[১৫] *কুরতুবী।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

রাগ মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী এক কু-রিপু

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) أَوْصِنِي. قَالَ : "لَا تَغْضَبْ". فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ : "لَا تَغْضَبْ".

সরল বাংলায় আনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) জনৈক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নবী (ﷺ)-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন : ক্রোধান্বিত হয়ো না।[১৬]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামের ব্যাপারে অনেক অভিমত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের আগে তাঁর নাম ছিল ‘আব্দুশ্ শামস বা আবদে ‘উমার। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় ‘আব্দুর রহমান। তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইবনু ফাহাম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম সাখর এবং মাতার নাম উম্মিয়া বিনতু সফীহ মতান্তরে মায়মুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ নামে নামকরণ : একদিন আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। বিড়ালটি হঠাৎ সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (ﷺ) তাঁকে রসিকতা করে– আবূ হুরাইরাহ্ অর্থাৎ- ‘হে বিড়ালের পিতা’! বলে সম্বোধন করলেন। এরপর থেকে তিনি আবূ হুরাইরাহ্ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে মুহার্‌রম মাসে খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছরের মতো।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি ইসলামের সব যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) এ সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : সাহাবীদের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৫৩৭৪টি মতান্তরে ৫৩৭৫টি। ইমাম বুখারীর মতে, আট শতাধিক রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসহাবে সুফ্‌ফা’র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু : তিনি ৫৭ মতান্তরে ৫৮/৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

রাগ বা ক্রোধ মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী এক কু-রিপু। রাগের সময় মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়। বাহ্যিকভাবে চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আর শিরা-উপশিরা ফুলে-ফেঁপে উঠে। অনিয়ন্ত্রিত রাগ নিজের ‘আমল-আখলাকের জন্য শুধু ক্ষতিকর এমন নয়; বরং শরীরের জন্যও ক্ষতিকর। অতিরিক্ত রাগের কারণে, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে; স্ট্রোকও করতে পারে। রাগের বশবর্তী হয়ে কারোর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। শুধু রাগের কারণে, কর্মস্থলে কতো হেনস্তা হতে হয় ভুক্তভোগী সকলেরই জানা। রাগের বিপরীত হলো সহনশীলতা। নবী করীম (ﷺ) উম্মতকে অত্যন্ত কঠোরভাবে অনুশীলন করে যে সকল চরিত্র অর্জন করতে বলেছেন, তার একটি হলো সহনশীলতা। জারীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।[১৭]

রাগ নেই, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। জ্ঞানীরা বলেন, রাগ হলো বারুদের গুদামের মতো, যা মানুষের স্বাভাবিক অর্জনকে মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ সাধারণত কোনো কারণ ছাড়া ক্রুদ্ধ হয় না। এর পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে। সেই কারণ যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আবার অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্যও হতে পারে। সাধারণত ব্যর্থতা, অযৌক্তিক প্রত্যাশা, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর মতো বদঅভ্যাস, অবিচার, যুল্‌ম ও দারিদ্র্যের মতো সামাজিক অসঙ্গতিগুলো মানুষের রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৬] *বুখারী- হা. ৬১১৬, ই. ফা., হা. ৪৫৭৩, আ. প্র. হা. ৫৬৭৬।*

[১৭] *সহীহ মুসলিম।*

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্থ ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। জীবনের এক কঠিনতম সময়ে আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) তায়েফে গিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন তায়েফবাসী তাঁর কথা শুনবে, তাঁকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সহযোগিতার পরিবর্তে তিনি পেলেন অপমান। তাঁর শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পায়ে গিয়ে জমাট বাঁধল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে একজন ফেরেশ্‌তা এলেন। ফেরেশ্‌তা তায়েফের দু'পাশের পাহাড় এক করে দিয়ে তায়েফবাসীকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু দয়াল নবী (ﷺ)-এর উত্তর ছিল, '(না, তা হতে পারে না); বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান দেবেন, যারা এক আল্লাহর 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে শরীক করবে না'। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : "لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, যে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়; বরং প্রকৃত বীর পুরুষ সে, যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে (অর্থাৎ- যে ক্রোধ সংবরণে সক্ষম সে প্রকৃত বীর পুরুষ)।[১৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ-র) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের আরো উপদেশ দিয়েছেন যে, "যদি তোমাদের কেউ রাগান্বিত হয়ে পড়ে, তবে তাকে নীরব থাকতে দাও।" যদি কোনো ব্যক্তি শান্ত বা নীরব হওয়ার চেষ্টা করে, তবে এই প্রচেষ্টা তাকে অবশ্যই মারামারি কিংবা বাজে কথা বলা থেকে বিরত রাখবে।

রাগ ঈমানকে নষ্ট করে : বাহয ইবনু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতার সূত্রে পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, সাবির গাছের তিক্ত রস যেমন মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।[১৯]

মোল্লা 'আলী ক্বারী (রহিমাহুল্লাহ-র) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন, এখানে ঈমান নষ্ট দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা ও নূর নষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। তবে কখনো কখনো মূল ঈমানও রাগের কারণে ঝুঁকিতে পড়তে পারে।[২০]

এ বিষয়ে আল্লামা মনজুর নুমানী (রহিমাহুল্লাহ-র) লিখেছেন, 'মানুষের খারাপ স্বভাবগুলোর মাঝে রাগ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি স্বভাব; এর পরিণতিও অনেক ভয়াবহ। কারো রাগ উঠলে, মহান আল্লাহর হুকুম-আহকাম, নিজের লাভ-ক্ষতির চিন্তা মাথায় থাকে না। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, রাগান্বিত অবস্থায় শয়তান যত সহজে মানুষকে কাবু করতে পারে, অন্যকোনো অবস্থায় পারে না। মানুষ ঐ অবস্থায় নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, কেমন যেন ইবলিসের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কখনো কখনো তো রাগের কারণে কুফ্‌রী শব্দ বলে ফেলে। এজন্য নবী (ﷺ) রাগকে ঈমান বিনষ্টকারী বলেছেন।[২১]

রাগ কীভাবে দমন করবেন : শয়তান মানুষের বিনাশ ও ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পায়। শয়তানের চতুর্মূখী কুমন্ত্রণায় পড়ে মানুষ যাবতীয় অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়। শয়তানের অস্ত্রগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড রাগ বা ক্রোধ অন্যতম। প্রচণ্ড রাগের সময় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) যেসব 'আমলের কথা বলেছেন, সেগুলো হলো–

১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা : শয়তানের শত্রুতার কবল থেকে নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ তাঁরই নিকট আশ্রয় চাইতে বলেছেন। এ ব্যাপারে বেশ কিছু হাদীস রয়েছে।

عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ". فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ (ﷺ) قَالَ إِنِّيْ لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ.

সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের মুখমণ্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমি এমন একটি কথা জানি, যা এই লোকটি বললে তার রাগ চলে যাবে'। সে যদি বলে– "আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। তাহলে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।" লোকেরা সে ব্যক্তিকে জানাল, 'রাসূল (ﷺ) বলেছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও।' তখন লোকটি বলল, 'আমি কি পাগল হয়েছি?'[২২]

'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল (ﷺ)-এর

[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৪।*
[১৯] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ।*
[২০] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০৭।*
[২১] *মাআরেফুল হাদীস- খণ্ড : ২, পৃ. ১৪৬।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৫।*

সামনে দু'ব্যক্তি পাগলামী করছিল। আমরাও তার কাছে বসা ছিলাম। তারা এতটা রাগান্বিত হয়ে পরস্পরকে গালি দিচ্ছিল যে, তাদের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন – 'আমি একটি কালেমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তাহলে তার ক্রোধ চলে যেত। অর্থাৎ- যদি লোকটি "আঊযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম" পড়তো।' তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, 'রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না?' সে বললো– 'আমি নিশ্চয়ই পাগল নই।'[২৩]

২. শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো রাগ উঠে, তখন যদি সে দাঁড়ানো থাকে, তবে যেন বসে পড়ে। যদি তাতে রাগ চলে যায়, তাহলে তো ভালো। আর যদি না যায়, তবে শুয়ে পড়বে।"[২৪]

শরহুস সুন্নাহ নামক কিতাবে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, 'বসা বা শোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন রাগের মাথায় এমন কোনো কাজ না করে, যার কারণে পরে লজ্জিত হতে হয়। কেননা, বসার কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। তার চেয়ে সম্ভাবনা কম থাকে যদি শুয়ে পড়ে। ইমাম ত্বিবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীস দ্বারা হয়তো বিনয়ী হওয়া উদ্দেশ্য। কেননা, রাগের বড় কারণ হলো অহংকার।[২৫]

৩. ওযূ করা : নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে (আসে)। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয়, সে যেন ওযূ করে।'[২৬]

৪. চুপ থাকা : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন করো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো; যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো।'[২৭]

সব রাগ নিন্দনীয় নয় : রাগ নিন্দনীয় বিষয় হলেও সব রাগ দোষনীয় নয়। এমন কিছু রাগ রয়েছে, যা প্রশংসনীয়। মূলত রাগ দুই প্রকার।

১. নিন্দনীয় রাগ : নিন্দনীয় রাগ হলো সেই সব জাগতিক রাগ, যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মতকে সতর্ক করেছেন। যেমনটি উপর্যুক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রশংসনীয় রাগ : যেসব রাগ আল্লাহ, তার রাসূল (ﷺ) ও দ্বীনের স্বার্থে করা হয়, তা প্রশংসনীয় রাগ। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারোর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে, তার জন্য যথাবিহিত শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।'[২৮]

রাগ নিয়ন্ত্রণের পুরস্কার : আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ﷺ) প্রচুর আত্মসংযম ও ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যখন তাঁকে অপমান, অপদস্ত ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল। রাগ নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, সে আধ্যাত্মিক ও জাগতিকভাবে পুরস্কৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বান্দার ক্রোধ সংবরণে যে মহান প্রতিদান রয়েছে, তা আর অন্য কিছুতে নেই।"[২৯]

সাহল ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সৃষ্টির মধ্য থেকে ডেকে নেবেন এবং তাকে হুরদের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো যেকোনো একজনকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেবেন।'[৩০]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যারা দুনিয়ায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, তারা এই মহা নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। ক্রোধের আগুনে অন্যকে জ্বালিয়ে দেওয়াই বীরত্ব নয়। এতে মানুষের সম্মান বাড়ে না; বরং ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণতা মানুষকে হালকা করে দেয়।

উপসংহার

রাগ বা ক্রোধ মানুষের জীবনের অন্যতম একটি মন্দ দিক। কারো রাগ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সেটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগান্বিত মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে অন্যের ওপর অবলীলায় অত্যাচার-অবিচার করে বসে। রাগ মানবিক আবেগেরই অংশ। তবে অনিয়ন্ত্রিত রাগ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। কেননা তা নানান সমস্যা সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, সে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল অঙ্গনে সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হয়। মাত্রাতিরিক্ত রাগ কখনোই ভালো নয়। সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য জরুরি। ❑

---

[২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৮৫।*
[২৪] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৪।*
[২৫] *মিরকাত শরহে মিশকা-তুল মাসা-বীহ- খণ্ড : ৯, পৃ. ৩০২।*
[২৬] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৮৬।*
[২৭] *মুসনাদে আহমদ- হা. ৪৭৮৬।*
[২৮] *আল জামে' বাইনাস সাহীহাঈন- হা. ৩১৮৪।*
[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৮৯।*
[৩০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৭৭৭।*

প্রবন্ধ

হিজরি সনের ইতিহাস

–মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

চান্দ্রবর্ষের ও চান্দ্রমাসের প্রভাব মুসলমানদের জীবনে ব্যাপক। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষত 'ইবাদতের তারিখ, ক্ষণ ও মৌসুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিজরি সনের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। একারণে হিজরি সনের হিসাব স্মরণ রাখা মুসলমানদের জন্য জরুরি। অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রভাব রয়েছে। যেমন- রমাযানের রোযা, দুই ঈদ, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলোতে চান্দ্রবর্ষ বা হিজরি সন ধরেই 'আমল করতে হয়। রোযা রাখতে হয় চাঁদ দেখে, ঈদ করতে হয় চাঁদ দেখে। এভাবে অন্যান্য 'আমলও। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলাদের ইদ্দতের ক্ষেত্রগুলোতেও চান্দ্রবর্ষের হিসাব গণনা করতে হয়। অর্থাৎ- মুসলমানদের ধর্মীয় কতগুলো দিন-তারিখের হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলোতে চাঁদের হিসাবে দিন, তারিখ, মাস ও বছর হিসাব করা আবশ্যকীয়। চান্দ্রবর্ষের হিসাব মেলালে দেখা যায়, একটি 'ইবাদতের মৌসুম কয়েক বছরের ব্যবধানে শীত-গরম-বর্ষায় পরিবর্তিত হতে থাকে। সৌরবর্ষের হিসাবে এটা হয় না।

হিজরি সনের প্রবর্তন : 'উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় খিলাফতকালে (১৩-২৩ হি.) হিজরি সন প্রবর্তন করেন এবং রবিউল আউয়াল মাসের বদলে মুহার্‌রম মাসকে ১ম মাস হিসাবে নির্ধারণ করেন। কারণ হজ্জ পালন শেষে মুহার্‌রম মাসে সবাই দেশে ফিরে যায়। তাছাড়া যিলহাজ্জ মাসে বায়আতে কুবরা সম্পন্ন হওয়ার পর মুহাররম মাসে হিজরতের সংকল্প করা হয়।

ঘটনা ছিল এই যে, আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে লেখেন যে, আপনি আমাদের নিকটে যেসব চিঠি পাঠান তাতে কোনো তারিখ থাকে না। যাতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ সভা ডাকেন। সেখানে তিনি হিজরতকে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী বলে আখ্যায়িত করেন এবং মুহাররম মাস থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর সকলে তা মেনে নেন। ঘটনাটি ছিল ১৭ হিজরি সনে।[৩১]

[৩১] *সহীহুল বুখারী ফৎহসহ- হা. ৩৯৩৪-এর আলোচনা; সীরাহ সহীহাহ্- ১/২২৩।*

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, সন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ সভার আহ্বান করেন। সভায় সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত ছিলেন। তিনি নবীজি (ﷺ)-এর ইন্তেকালের বছর থেকে; ত্বালহাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবুওয়াতের বছর থেকে; আর 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিজরতের বছর থেকে বর্ষ গণনার প্রস্তাব দেন। পরে সবাই 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রস্তাবকে যুক্তিযুক্ত মনে করে ঐকমত্য পোষণ করেন।[৩২]

বর্ষ গণনার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৭তম বছরের ১০ জুমাদাল উলা মাসে। মাস হিসেবে সমকালীন আরবে মুহার্‌রম ছিল প্রথম মাস। পরিস্থিতি বিবেচনায় ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তা অপরিবর্তিত রাখা হয়।[৩৩]

মুহার্‌রম মাস দ্বারা কেন হিজরি সন শুরু হয়? রবিউল আউয়াল মাসই হিজরি সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত ছিল। কেননা এ মাসেই রাসূল (ﷺ) মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন; কিন্তু রবিউল আওয়ালের পরিবর্তে মুহার্‌রম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে, রাসূল (ﷺ) মুহার্‌রম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। মদীনার আনসারগণ দশই যিলহাজ্জ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং যিলহাজ্জের শেষ তারিখে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে মুহার্‌রমকে হিজরি সনের প্রথম মাস করা হয়েছে। এছাড়া 'উসমান এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরামর্শ দেন যে হিজরি সনের সূচনা মুহার্‌রম মাস থেকেই হওয়া উচিত। কেউ কেউ বললেন, রমাযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, মুহার্‌রম মাসই উপযুক্ত মাস। কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহার্‌রম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর ওপরই সবাই একমত হন'।[৩৪]

তাছাড়া ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেন, চান্দ্রমাস তথা আরবী মাসের তারতীব ও ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর

[৩২] *ফাতহুল বারী- ইবনু হাজার আসকালানী, ৭/২৬৮; উমদাতুল কারী- আল-আইনী, ১৭/৬৬।*

[৩৩] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া- ৪/৫১৭।*

[৩৪] *ফাৎহুল বারী- বাবুত তারিখ, ৭/২০৯; তারিখে তাবারী- ২/২৫২; যারকানী- ১/৩৫২; উমদাতুল ক্বারী- ৮/১২৮।*

নাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই নামগুলো কোনো মানুষের রাখা নয়।

হিজরতের বছর থেকেই সন গণনার তাৎপর্য : আবার কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তা বলেন, সন গণনার আলোচনার সময় প্রস্তাব উঠেছিল, ঈসায়ী সনের সূচনার সঙ্গে মিল রেখে নবীজীর জন্মের সন থেকে ইসলামী সনের শুরু হোক। এ রকম আরও কিছু কিছু উপলক্ষের কথাও আলোচিত হয়। কিন্তু হিজরতের সন থেকে সন গণনা চূড়ান্ত হওয়ার পেছনে তাৎপর্য হলো, হিজরতকে মূল্যায়ন করা হয় 'আল ফারিকু বাইনাল হাক্কি ওয়াল বাতিল' অর্থাৎ- সত্য-মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী বিষয় হিসাবে। হিজরতের পর থেকেই মুসলমানরা প্রকাশ্য 'ইবাদত ও সমাজ-গঠনের রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন। প্রকাশ্যে আযান, সালাত, জুমু'আহ্, দুই ঈদ সবকিছু হিজরতের পর থেকেই শুরু হয়েছে। এসব তাৎপর্যের দিকে লক্ষ করেই মুসলমানদের সন গণনা হিজরত থেকেই শুরু হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

বাংলাদেশে হিজরি সনের প্রচলন : ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হিজরি সন প্রবর্তিত হওয়ার এক বছর পরই আরব বণিকদের আগমনের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও হিজরি সনের প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে ৫৯৮ হিজরি মোতাবেক ১২০৯ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে বাংলার জমিনে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সূচিত হয়। এর ফলে হিজরি সন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের মাধ্যমে জাতীয় সন গণনায় পরিণত হয়। সন গণনায় ৫৫০ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর থাকার পর ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে হিজরি সনের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অবসান হয়।

মুসলিম জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব

মহান আল্লাহর আদেশ : হিজরি সন হলো চান্দ্র মাস। আর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে সময় নির্ধারণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশের প্রতি সম্মানার্থে হিজরি সন গণনা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, "লোকেরা আপনাকে নবচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, তা হলো মানুষের এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণকারী।"[৩৫]

[৩৫] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৯।*

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে পঞ্জিকাস্বরূপ চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য চন্দ্র মাস তথা হিজরি সনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মহান আল্লাহর নিদর্শন : আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র মাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলেন, আমি রাত ও দিনকে করেছি দৃষ্টি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকজ্জ্বল করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে সক্ষম হও এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যাও হিসাব করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করছি। এ আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যায় যে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহস্বরূপ তাঁর বান্দাদের সাল গণনা ও অন্যান্য হিসাব-নিকাশের জন্য দিন-রাতকে সৃষ্টি করেছেন।

রাসূল (ﷺ) ও আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনন্য স্মৃতিচারণ : হিজরি সাল গণনা করা হয় রাসূল (ﷺ)-এর হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ফলে হিজরি সন ব্যবহার ও গণনার ফলে রাসূল (ﷺ) ও আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই হিজরতের ঘটনা মুসলিম হৃদয়ে বার বার দোলা দেয়।

আবার স্বয়ং রাসূল (ﷺ) তাঁর উম্মতদের নির্দেশ দিয়ে বলছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো'।[৩৬]

'ইবাদত-বন্দেগী আদায় : ইসলামের অধিকাংশ 'ইবাদত-বন্দেগী যেমন- সিয়াম, হজ্জ, কুরবানী, লায়লাতুল ক্বদ্‌র, আশুরা ইত্যাদি 'ইবাদত হিজরি সনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। ফলে হিজরি সনের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক সময়ে 'ইবাদত করা সম্ভব হয়। এজন্য তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে, হিজরি সন তথা চান্দ্রমাস গণনাকে ফরযে কিফায়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদার অনুকরণ : হিজরি সন হলো 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত। আর রাসূল (ﷺ) তাঁর এবং তাঁর খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা'।[৩৭]

[পরবর্তী অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯০৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৮৯; মুসনাদে আহমাদ- হা. ৯৫৫৬।*

[৩৭] *মুশকিলুল আসার লিত তাহাবী- হা. ৯৯৮।*

নিভৃত ভাবনা

ঈদ আনন্দ

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

গত ১৭/০৬/২০২৪ ইং তারিখে মহাসমারোহে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো ঈদ-উল-আযহা।[৩৮] ইসলামী চান্দ্র পঞ্জিকায় ঈদ-উল-আযহা যিলহাজ্জের ১০ তারিখে পড়ে। সে অনুসারে সোমবার দিবসটি পালিত হয়। মহান আল্লাহর নিকট মাসসমূহের মধ্যে যিলহাজ্জ মাস অধিক সম্মানিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি (যথা- মুহার্‌রম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস্ সানী, জুমাদাল উলা, জুমাদাস্ সানীয়া, রজব, শা'বান, রামাযান, শাওয়াল, যিলক্বাদ ও যিলহাজ্জ)। এর মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস (যিলক্বাদ, যিলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রজব) হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।"[৩৯]

ইসলামে খুশির দিন দু'টি : ঈদ-উল-ফিত্‌র ও ঈদ-উল-আয্‌হা। ঈদ অর্থ আনন্দ, উৎসব, পুনরাবৃত্তি কিংবা বার বার ফিরে আসা ইত্যাদি। ১০ যিলহাজ্জ মহান স্রষ্টার নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্যে পশু যবাহের মাধ্যমে উৎসবটি পালিত হয়। দীর্ঘ ১০টি দিন নখ, চুল কর্তন থেকে বিরত থাকতে হয়। আর যিলহাজ্জ মাসের ১ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত সিয়াম পালন উৎসবটিকে মহিমান্বিত করে তোলে। এ দিবসে বিশ্ব মুসলিম সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শামিল হন, আনন্দের বিশেষ মোহনায়।

সুপ্রিয় পাঠক, পবিত্র ঈদ-উল-আয্‌হা মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান রাব্বুল 'আলামীনের এক বিশেষ নিয়ামত। দিনটিতে মু'মিনের হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার আসে। সকল খোদা প্রেমিক বান্দা পশু কুরবানির মাধ্যমে মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য অর্জনের প্রয়াসে ব্যাকুল থাকে। সঙ্গত কারণেই মুসলিম উম্মাহর জীবনে ঈদ-উল-আয্‌হার গুরুত্ব অপরিসীম। ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) চেতনার মর্মমূল অনুসরণ করে জাগ্রত জাতি হিসেবে বিচ্ছুরিত হয় আনন্দের ফল্গুধারা। আল্লাহ তা'আলা নবী ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-কে পরীক্ষার যুপকাষ্ঠে দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করেছেন তিনি খোদাপ্রেমী। পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-রএর গলদেশের পরিবর্তে ছুরি রক্ত প্রবাহিত করলো দুম্বার গলায়। পরম ভালোবাসার নির্মল আনন্দ আর কী হতে পারে! 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র বরাতে বর্ণিত হাদীস সূত্রে জানা যায়, 'ঈদ উল আয্‌হার দিন সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় 'আমল হলো কুরবানী করা'। জামে' আত্ তিরমিযীতে উদ্ধৃত একটি হাদীস সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, কিয়ামতের ময়দানে যবাইকৃত পশু তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় হাজির হবে। নিশ্চয়ই কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ

---

* **প্রফেসর,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৩৮] ঈদ-উল-আযহা নামটি আন্দোৎসবের নাম। পৃথিবীর বহুদেশে তদীয় স্থানীয় ভাষায় কুরবানী ঈদের চিত্তাকর্ষক নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- জার্মান ভাষায় Operfest, ওলন্দাজ ভাষায় Ofterteest, রোমানীয় ভাষায় Sarbatoarea Sacriticiului, হাঙ্গেরী ভাষায় Aldosati Uinnep, স্পেনীয় ভাষায় Fiesta del Cordero বা Fiesta del Borrego, মিশর, সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে Id al Baqarah, তুরস্কে Kurban Bayarami, ত্রিনিদাদে Bakara Eid, মাগবেবে Id el-Kebir, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইন Iduladha, Hari Raya Aidicl-adha, Hari Raya Hai এবং ভারত, পাকিস্তানে বকরা ঈদ নামে পরিচিত। বাংলাদেশেও বকরা ঈদ নামটির প্রচলন দেখা যায়।

[৩৯] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।

তা'আলার দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। অতএব তোমরা কুরবানীর মাধ্যমে নিজেদের পবিত্রতা অর্জন করো এবং খুশিমনে আনন্দ চিত্তে কুরবানী করো। কুরবানীর ক্ষেত্রে আল্লাহ ভীতির অসামান্য প্রভাব তা কবুলিয়তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

আদম তনয় হাবিল ও কাবিলের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাদের খোদাভীতির রকমফের। কাবিলের কুরবানী প্রত্যাখ্যাত হয় ও হাবিলের কুরবানী গৃহীত হয় শুধুমাত্র আল্লাহভীতির কারণে।

﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।"[৪০] ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন সফল হলেন আত্মিক পবিত্রতার উপর ভর করে আর অন্যজন পথহারা হলেন লোভ ও প্রতিহিংসার অনলে।

আজও আমাদের সমাজে আল্লাহ ভীতির প্রশ্ন উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। মূল্যমানের বিচারে কুরবানী যতই বড় হোক না কেন আল্লাহ ভীতির অভাবে হয়তোবা তা প্রভুর দরবারে গৃহীত হয় না। সুতরাং পারলৌকিকসমূহ কল্যাণ অর্জনের সোপান হতে পারে এই ঈদ। ঈদের আনন্দ উচ্ছাস তখনই নির্মলা ও সম্ভ্রমপূর্ণ হবে যখন ঈদের পশু জবাই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

ইসলামের সোনালী দিনের মানুষেরা ঈদের চাঁদ দেখার পর অর্থাৎ- প্রথম যিলহাজ্জের দিন থেকে বেশি বেশি 'ইবাদত করতেন। বেশি বেশি দান করতেন। খোঁজ নিতেন নিরন্ন-বঞ্চিতদের। পাশে দাঁড়াতেন নানা উপহার-উপাচার নিয়ে। কিন্তু আজকাল আর তেমনটি হতে দেখা যায় না। অজ্ঞতা ও অহংবোধের বেড়াজালে সমাজ যেন নেতিয়ে পড়ছে। ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে ঈদের আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়েছে।

ঈদের আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠানসমূহে নানা বিধি-নিষেধ ইসলাম প্রিয় মানুষদের হতবিহ্বল করে তুলেছে। রাস্তায় ঈদের নামায না পড়া কিংবা কুরবানী না করার ব্যাপারে রাষ্ট্র বিশেষের নিষেধাজ্ঞা আনন্দের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে বাধা দিতে চাইছে। এবিপি আনন্দসহ ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুধুমাত্র নির্ধারিত স্থানে নামায পড়তে হবে। রাস্তা অবরোধ করা যাবে না।

সম্মানিত পাঠক! প্রায় ত্রিশ কোটি মুসলমান অধ্যুষিত ভারতে নির্ধারিত স্থানে সংকুলান না হওয়ার কারণে রাস্তা অবধি সামান্য সময়ে নামায হলে তো জায়গাটি অপবিত্র হয়ে যায় না। কিন্তু ইসলামও মুসলিমদের ব্যাপারে রাষ্ট্রবিশেষের এ ধরনের নাগরিক অধিকার হরণ আর যাই হোক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় বহন করে না। পশু কুরবানীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুঁশিয়ারি কুরবানীর আনন্দকে দুঃখজনকভাবে নিরানন্দে পরিণত করেছে। ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ২০টিতেই গরু জবাই নিষিদ্ধ। এ ধরনের অব্যক্তবেদনা মুসলিম জনতাকে মর্মাহত করেছে। ফ্রিজে গো-মাংস রাখার অভিযোগে ভারতের মান্দালায় ১১টি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।[৪১] আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবে মুসলিম দেশসমূহে ঈদ উদ্‌যাপনে অনীহা মুসলিমদের ভাবিয়ে তুলেছে। আনন্দের পরিবর্তে বর্জনের কুৎসিত মহড়া আমাদের অবাক করে তুলেছে। মুসলিম অধ্যুষিত তাজিকিস্তানে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়েছে। পাসকৃত আইনটির মাধ্যমে ঈদ উদ্‌যাপনেও বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈদ উদ্‌যাপনকে বিদেশি সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে বর্জনের ন্যাক্কারজনক ইঙ্গিত দিয়েছে আইনটিতে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়, শিশুরা ঈদ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবে না। দেশটিতে তা 'ইদগারাক' নামে পরিচিত। ৯৬.৪ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশটির কর্তা ব্যক্তিদের এহেন সিদ্ধান্ত ইসলাম বিমুখীনতার ভাবনাকে প্রকট করে তুলেছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ফিতরাতের ধর্ম। অনুশীলন অনীহা-অনাগ্রহ মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনাচারকে এড়িয়ে ক্রমশ উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ধাবিত করছে। সুতরাং ইসলামবোধে জাগ্রত করার জন্য সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। ইসলামের সুশীতল ছায়া থেকে যাতে মানুষ বঞ্চিত না হয় সে জন্য যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। অসভ্য বর্বর সমাজের অগ্রযাত্রায় যে ধর্ম বিপ্লব এনে দিয়েছিল আজ সে ঐতিহ্য সমুন্নত করতে হবে। তাহলেই মানুষ ফিরে পাবে ঐতিহ্যিক আনন্দের স্বাদ ও সুঘ্রাণ। সুরভিত হবে সমাজ। পূনর্বার বিনির্মিত হবে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার পরীক্ষিত ও সৌন্দর্যময় পরিকাঠামো। ❑

[৪০] সূরা আল মায়িদাহ্ : ২৭।

[৪১] যুগান্তর, ২৩ জুন ২০২৪।

সাহাবা চরিত

রঈসুল মুফাস্‌সিরিন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)

–ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

ভূমিকা : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব জাতির হিদায়াতের উৎস। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ এ মহাগ্রন্থের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। এ অলৌকিক কিতাবকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অভিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে তাফসির অভিজ্ঞান হচ্ছে অন্যতম। আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী মানুষ যাতে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করে ধন্য হতে পারে, সে অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখেই মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম এ কিতাবের তাফসির করেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতঃপর তাঁর সাহাবীগণ। রাসূল (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাফসির চর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) অন্যতম। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)’র তাফসীরের সংকলন করা হয় তানবীরুল মিক্বয়াস মিন তাফসীরি ইবনু ‘আব্বাস গ্রন্থে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুফাস্‌সীরদের শিরোমণি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)’র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর অনবদ্য তাফসীরের রচনা পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম ‘আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূল ‘আব্বাস, মাতা উম্মুল ফযল লুবাবাহ বিনতিল হারিস ইবনু হাযান আল-হিলায়্যাহ। পিতা ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদিল মুত্তালিব ইবনু হিশাম ইবনে আবদে মানাফ আল-কুরাশী আল-হাশিমী। তাঁর এ বংশ পরম্পরা মহানবী (ﷺ) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন রাসূলের আপন চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু’মিনীন মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)’র ভাগ্নে এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী।[৪২]

জন্ম : ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হিজরতের তিন বছর মতান্তরে পাঁচ বছর পূর্বে মক্কার শিআবে আবী ত্বালিবে তাঁর জন্ম। জন্মের পর পিতা তাকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন। জন্মের পর তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপস্থিত করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখের লালা ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র মুখে লাগিয়ে দু‘আ করেন,

اللّٰهُمَّ فقهه في الدين وعلمه التأويل.

হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে (ইবনু ‘আব্বাস) দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করো এবং তাবীল শিক্ষা দাও।

তাঁর এ দু‘আর বরকতে তিনি উত্তরকালে এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরে পরিণত হন। নবী (ﷺ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তের বছর।

মহানবীর সাহচার্য : উম্মুল মু’মিনীন ‘আব্দুল্লাহর খালা হওয়ায় অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর কাছে কাটাতেন। মাত্র সাত বছর বয়স হতেই তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নবীজীর একান্ত সেবক ছিলেন। সফরে তিনি বাহনের পেছনে আরোহণ করে তাঁর সফর সঙ্গী হতেন।

জ্ঞানার্জন : ছোটবেলা থেকেই ইবনু আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মধ্যে জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়। তিনি মহানবী (ﷺ)-এর শিক্ষা ও কর্মের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সব সময় তাঁর ঘরেই অবস্থান করতেন। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে কুরআন ও সুন্নাহর অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার সম্যকভাবে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করতে সক্ষম হন। যদিও তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্যে বেশি দিন থাকার সুযোগ পাননি। তারপরও যতদিন তিনি তাঁকে পান, ততদিন পর্যন্ত তিনি অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্ঞান অন্বেষণের আগ্রহে ভাটা পড়েনি। অধীর উৎসাহ ও প্রেরণার মাধ্যমে তিনি জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন।

আল-কুরআনের মর্ম জানার প্রতি তাঁর এত অনুরাগ ছিল যে, তিনি এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রবীণ সাহাবীদের দ্বারস্থ হতেন। তিনি একাধারে যুগের ফকীহ, মুফাসসিরগণের ইমাম, জ্ঞানের আধার ইত্যাকার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি তর্জুমানুল কুরআন হিসেবে আখ্যায়িত হন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন মুহাম্মদীর কিংবদন্তী। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হিবরুল উম্মাহ ও তারজামানুল কুরআন। এসব কারণেই তাঁকে রঈসুল মুফাসসিরীন ও সুলতানুল মুফাসসিরীন বলা হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর এ উম্মাতের মধ্যে আল-কুরআনের তাফসীরে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

---

* ***জমঈয়ত উপদেষ্টা,*** *সাবেক ডিন ও প্রফেসর- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৪২] *আল ইসাবা ফী তামীঈযিস সাহাবা- ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।*

১১ বছর বয়সে পিতা 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিজরি ৮ম সনে সপরিবারে মাদীনায় হিজরত করেন।

বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশ-অবসাদ তাঁকে পায়নি। কোন গ্লানি তাকে অবসন্ন করতে পারেনি। মহানবী (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে তিনি তার জ্ঞান চর্চার এই ধারাকে অব্যাহত রাখেন। খিলাফতকালে মক্কার তাফসির চর্চা কেন্দ্রের তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাফসির অভিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি দেখে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে আল-কুরআনের ভাষ্যকার উপাধিতে ভূষিত করেন। সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নিতেন। কুরআনের মর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ও ভাষাসমূহ একত্রিত করে পরবর্তীতে কিছু সংকলনও প্রস্তুত করা হয়েছে। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর ১৬৬০টি হাদীস স্থান পেয়েছে। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর তাফসিরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। তাঁর বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এজন্য তিনি মজলিসে শূরার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতেন।

প্রখ্যাত সাহাবীদের থেকে জ্ঞান : শিক্ষা অর্জনের ফলশ্রুতিতে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীতে রূপান্তিত হন। এ কারণে দেখা যায় ফাতাওয়া ও তাফসির শাস্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল।[৪৩]

প্রচণ্ড মেধা শক্তির অধিকারী হওয়ায় তার জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে সহজ হয়। বর্ণিত আছে আরব কবি 'উমার ইবনু আবী রাবি'আহ্ কর্তৃক রচিত কাসিদার ৮০ পঙ্‌ক্তি মাত্র একবার শুনে তিনি মুখস্থ করে ফেলেন।

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা), 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), যায়েদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উল্লেখযোগ্য। অনেক তাবেঈ তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাহিমাহুল্লাহ-র), মুজাহিদ ইবনু জবর (রাহিমাহুল্লাহ-র), তাউস ইবনু কায়সান (রাহিমাহুল্লাহ-র), ইকরামা মাউলা ইবনু 'আব্বাস ও 'আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-র)।

ইসলাম গ্রহণ : তাঁর মাতা লুবাবা বিনতু হারেস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিধায় 'আব্দুল্লাহ আশৈশমুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৩৭ ও ৩৮ হিজরিতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেন।

হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ৬ জন সাহাবীর অন্যতম হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে সহীহুল বুখারীতে ১২০টি এবং সহীহ মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

দৈহিক গঠন ও চরিত্র : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন সামান্য মোটা ও দীর্ঘকায়। চেহারা ছিল সুন্দর ও লাবণ্যময় মাথায় ছিল যথেষ্ট চুল, যাতে তিনি মেহেদী লাগাতেন।[৪৪]

তার পিতা ছিলেন তার চেয়েও লম্বা এবং দাদা ছিলেন তার পিতার চেয়েও লম্বা, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও জ্ঞানী। তিনি স্বচক্ষে দু'বার জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দেখেছেন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর নিকট থেকে খলিফা 'উমার ও 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) পরামর্শ নিতেন। তাঁর সম্পর্কে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন– هو فتى الكهول (তিনি বয়সে নবীন আর জ্ঞানে প্রবীণ)। তিনি ছিলেন রঈসুল মুফাস্‌সিরীন। তাঁর লিখিত তফসীরগ্রন্থ "তাফসীরে ইবনু 'আব্বাস" জগদ্বিখ্যাত।

জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে জিব্‌রা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে দুইবার দেখেছেন।

'আত্বা ইবনু ইয়াসার বলেন : 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে কিছু লোক আসত কবিতা সম্পর্কে জানতে, কেউ কেউ বংশলতা সম্পর্কে, কেউ যুদ্ধ বিগ্রহ, ফিকহ তাফসির ও তা'বীল ইত্যাদির জ্ঞান সম্পর্কে জানতে তিনি সকল ব্যাপারে অকাতরে তাদের মাঝে জ্ঞান বিতরণ করতেন। বিনিময়ে তাদের কাছ হতে কিছুই গ্রহণ করতেন না।[৪৫]

বিভিন্ন দায়িত্ব পালন : ইবনু 'আব্বাস রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যথেষ্ঠ অবদান রাখেন। তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে মিশরের গর্ভনর 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় অভিযানের সময় মুসলিম পক্ষের দূত হিসেবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজিসের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তার প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন; আমার ধারণা আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।[৪৬]

---

[৪৩] *আত্ তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন- ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১।*

[৪৪] *আসমাউর রিজাল- পৃ. ৮৪।*

[৪৫] *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- পৃ. ৩৮২।*

[৪৬] *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩।*

হিজরি ৩৫ সনে ইবনু ‘আব্বাস আমিরুল মু’মিনীন ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গৃহবন্দী অবস্থায় খলীফা কর্তৃক আমিরুল হাজ্জ নিযুক্ত হন। তিনি ‘আলীর খিলাফতকালে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি বসরার সাথে ইরানের গভর্নর নিযুক্ত হলে তথাকার খারেজী বিদ্রোহ দমন করেন।

‘আলী ও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সংঘাতের সময় ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ ত্যাগকারী কিছু লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্য ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি খারিজীদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তারা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নিলে বিশ হাজার লোক পুনরায় ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দলে যোগ দেয়। অবশিষ্ট চার হাজার ‘আলীর বিরোধিতায় হটকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।[৪৭]

তিনি ‘আলীর খিলাফতকালে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি খারিজীদের সাথে ‘আলীর নাহরাওয়ান্দে যুদ্ধে ৭ হাজার সৈন্যসহ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস যোগদান করেন। হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র খিলাফতকালে তিনি সেনাপতি ছিলেন। তিনি খিলাফতের দাবিদার ইমাম হাসান ও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)’র মধ্যে বিরাজমান মনোমালিন্যও মীমাংসা করেন। মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তাঁকে যথাযথ সম্মান করেতেন।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠা : ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটলে ‘আব্বাস মক্কাতে প্রতিষ্ঠা করেন মাদরাসায়ে ইবনু ‘আব্বাস। নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেননি এমন কোনো উপদেশ তিনি কখনো কাউকে দেননি। ইবনু ‘আব্বাসের এ শিক্ষাকেন্দ্রে হাজার হাজার শিক্ষার্থী আগমন করে আল-কুরআনের তাফসির শিক্ষা করতেন। এই মাদরাসার ছাত্ররা সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর, মুজাহিদ, ইকরিমা, তাউস ইবনু কায়সান, ‘আত্বা ইবনু আবী রাবি‘আহ্ দাহহাক আল ইয়ামানী।[৪৮]

রচনাবলী : তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে–

১. তানবীরুল মিক্বয়াস মিন তাফসীরি ইবনু ‘আব্বাস (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)।
২. আল ক্বামুসূল মুহীত্ব (القاموس المحيط)।
৩. বাসাইরু যাওয়িত তামীয ফী লাতাইফিল কিতাবিল ‘আযীয (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)।
৪. আল-বালাগাতু ফী তারাজিমি আয়িম্মাতিন নাহভি ওয়াল লুগাত (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة)।

[৪৭] *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।*
[৪৮] *মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।*

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর তাফসির সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি :

১. ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু ‘আব্বাসের তাফসির সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেন,

كأنما ينظر إلى الغيب من سِتر رقيق.

“তিনি যেন পর্দার আড়াল থেকে অদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।”

২. ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

نِعْمَ ترجمان القرآن ابن عباس.

“তিনি কুরআনের সর্বশেষ ভাষ্যকার।”

৩. ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

ابن عباس أعلم أُمَّة محمد بما نزل على محمد.

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে ইবনু ‘আব্বাস এ উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

৪. হিসাম ইবনু উরওয়া, তাঁর পিতা উরওয়াকে, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, তাঁর তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নজরে পড়েনি।[৪৯]

৫. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ছাত্র মুজাহিদ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন পবিত্র কুরআনের তাফসির করতেন তার উপর নূর প্রজ্জ্বলিত হত। ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তাফসির করার সময় মনে হয় যে, ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একটি স্বচ্ছ পর্দার আড়াল হতে আদৃশ্য বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ করেন।[৫০]

৬. মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইকরামাকে উদ্দেশ্য করে বলেন : জীবিত ও মৃত উম্মাতে মুহাম্মীর মাঝে তোমার মনিব সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ।[৫১]

৭. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মুলাইকা নামক এক রাবী বলেন, একদা আমি মক্কায় ইবনু ‘আব্বাসের সফরসঙ্গী ছিলাম। কোথাও বিশ্রামের জন্য তাঁবু খাটানো হলে তিনি রাতের একটি অংশ নামাযের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। অন্য এক রাতে তাঁকে একাগ্রচিত্তে কুরআনের আয়াত– ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ﴾ “মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে এ থেকেই তুমি টালবাহানা করছ” পাঠ করতে শুনেছি।

[৪৯] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুব তাফসীর।*
[৫০] *মানহিজুল মুফাস্সিরুন- ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।*
[৫১] *প্রাগুক্ত- পৃ. ৬৪-৬৫।*

দায়িরায়ে মাআরিফে ইসলামীয়া গ্রন্থে ড. হুসাইন আয-যাহাবীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনু ‘আব্বাসের জ্ঞান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেন– ১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য দু‘আ করেন। ২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিবার থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন। ৩. তিনি বড় বড় সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেন। ৪. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেন এবং ৫. তাঁর প্রখর মুখস্থ শক্তি ছিল।

৮. তাঁর সম্পর্কে ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রায়ই বলতেন, **(هو فتى الكهول** “বয়সে তরুণ, জ্ঞানে প্রবীণ”; **(له لسان سؤل وقلب عقول)** “তিনি জিজ্ঞাসু রসনা ও বুদ্ধিদীপ্তমনের অধিকারী।

তিনি আরো বলতেন, **(أفقهم في كتاب الله عز)** “তাফসির অভিজ্ঞানে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। যেমন- এক ব্যক্তি ইবনু ‘উমারের নিকট এসে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

“নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন একত্রিত অবস্থায় ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি।”[৫২]

এতে উল্লেখিত **رَتْقًا** ও **فَفَتَقَ** শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, ইবনু ‘আব্বাসের নিকট যাও। লোকটি ইবনু ‘আব্বাসের নিকট গিয়ে আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আসমান ও যমীন একত্রিত থাকার অর্থ হলো– আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করত না, আর যমীনের শস্য উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা এবং যমীনকে শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে দিয়ে উভয়কে বন্ধাত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন। **رَتْقًا** এবং **فَفَتَقَ** দ্বারা এ রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইবনু ‘আব্বাসের মুখ থেকে এ সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা শুনে লোকটি বিস্মিত হন এবং ইবনু ‘উমারকে এ ব্যাখ্যাটি জানিয়ে দেন। ইবনু ‘উমার শুনে বললেন, আমি জানি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান দান ও অনুগ্রহ দান করেন।

৯. মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إنه إذا فسَّرَ الشئ رأيت عليه النور.

“যখন তিনি কুরআনের কোন আয়াতের তাফসির করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে জ্যোতি উদ্ভাসিত হতো।”

১০. বিশিষ্ট তাবিঈ তাউস ইবনু কায়সান বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীগণের পরিবর্তে অল্প বয়সের ইবনু ‘আব্বাসকে শিক্ষক হিসেবে গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি উত্তরে বলেন,

إني رأيت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ إذا تداءوا في أمرٍ صاروا إلى قول ابن عباس.

আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্তরজন সাহাবীকে কোন না কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইবনু ‘আব্বাসের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে দেখেছি।

ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল-কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রথমে আয়াত তারপর হাদীস এরপর কুরআন সুন্নাহ সমর্থিত ইজতিহাদ, অথবা আহলে কিতাবদের বর্ণনা, এরপর আরবদের রীতিনীতি এবং তাদের প্রচলিত বাগধারা প্রবচনেরও সাহায্য নিতেন। তার বর্ণিত অধিকাংশ তাফসির শব্দগত বিশ্লেষণের নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কুরআনের দুর্বোধ্য অর্থ পরিষ্কার করার জন্য জাহেলী কবিদের কবিতার প্রতি অনেকাংশে নির্ভর করতেন।

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب.

যখন তোমরা মহান আল্লাহর কিতাবের কোন কিছু বুঝতে না পার তখন তার অর্থ আরবদের কবিতায় খোঁজ করো কেননা কবিতা আরবদের জীবন-দর্পণ।[৫৩]

ইন্তিকাল : ৭১ বছর বয়সে হিজরি ৬৮ সালে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর-এর খেলাফতকালে তায়েফ নগরে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। তায়েফ নগরে মাসজিদে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামক বিশাল মাসজিদটি আজও স্মৃতি বহন করে চলছে। এ মাসজিদের পিছনেই এক পাশে এ মহান জ্ঞান সাধক সাহাবীর কবর।[৫৪] ❑

[৫২] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৩০।*

[৫৩] *আল ইতকান- ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯৭।*

[৫৪] *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা- ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯।*

ক্বাসাসুল কুরআন

হারূত-মারূতের কাহিনি

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

ফেরেশ্তা মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাদের রয়েছে নিজস্ব জগৎ। মানবসমাজে তারা আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করলেও তারা মানুষের দৃষ্টি ও স্পর্শের বাইরে। পৃথিবীতে এমন দু'জন ফেরেশ্তার আগমন ঘটেছিল তারা মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন এবং মানবসমাজে অবস্থান করতেন। তারা পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষদের পরীক্ষা করার জন্য। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে তাদের নাম হারূত ও মারূত। আল্লাহ আল কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

"আর সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান কুফ্রী করেননি; বরং শয়তানরাই কুফ্রী করেছিল। এইভাবে যে তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত ফেরেশ্তাদ্বয়ের প্রতি ও কোনো প্রকার যাদু বিদ্যাগত অবতীর্ণ করা হয় না বাবেল শহরে, এই যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত বিশেষভাবে হারূত ও মারূত শয়তানদের মধ্য হতে এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না যে পর্যন্ত তারা না বলতো যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। অতএব, তুমি কুফ্রী করো না তারা একথা বিদ্রূপ আকারে বলত প্রকৃত পক্ষে নয়; অতঃপর যা দ্বারা স্বামী ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তারা উভয়ের নিকট তা শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তদদ্বারা কারো ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয় আর তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোনো উপকার করত না এবং অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তারা জ্ঞাত আছে যে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। আর যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে তা যে কত নিকৃষ্ট যদি তারা তা জানতো!"[৫৫]

হারূত-মারূতের পরিচয় : ইবনু হাজার (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা ইবনু কাসির (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ বেশিরভাগ তাফসিরবিদ এ বিষয়ে একমত যে হারূত-মারূত ফেরেশ্তা ছিলেন। তাঁরা বলেন, হারূত-মারূত মহান আল্লাহর প্রেরিত দু'জন ফেরেশ্তা। তাঁরা মহান আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। তবে তার আগে সতর্ক করে বলত, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। তোমরা কুফ্রী করো না।[৫৬]

তবে ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হারূত-মারূত ফেরেশ্তা নয়; বরং ফেরেশ্তাদের মুখপাত্র ছিলেন।[৫৭]

মূল ঘটনা : সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোঁকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন। তিনি কোনো নবী নন। শয়তানদের ভেল্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এমনকি শেষনবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর প্রশংসা করেন, তখন ইহুদি নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র। নইলে স্বাভাবিকভাবে কোনো মানুষ কি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে?[৫৮]

এক্ষণে সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) যে সত্য নবী, তিনি যে যাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু'জিযাহ্ ও শয়তানদের যাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফেরেশ্তাকে 'বাবেল' শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। 'বাবেল' হলো ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐসময় যাদু বিদ্যার কেন্দ্রছিল। ফেরেশ্তাদ্বয় সেখানে এসে যাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং যাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুয়তের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন।[৫৯]

---

[৫৫] *সূরা আল বাক্বারাহ : ১০২।*
[৫৬] *ফাতহুল বারি- ১০/২২৪।*
[৫৭] *তাফসীরে তাবারী- ২/৩৩৯।*
[৫৮] *ইবনু জারীর।*
[৫৯] *নবীদের কাহিনি- ২/১৫৬-৫৭।*

ইমাম তাবারী (রাহিমাহুল্লাহ-র) ও ইবনু জারির (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর মতে, কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ মালাকাইনে বা মালিকাইনে এখানে দু'টি পঠন রীতিই চালু আছে। যদি বলা হয় 'মালিকাইনে (দু'জন শাসক)', তাহলে এর ব্যাখ্যা হলো হারুত মারুত কোনো ফেরেশ্তা নন; বরং তৎকালীন সময়ের দু'জন বাদশা, যারা কোনো অপরাধ করেছিলেন আর মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, আমাদের দুনিয়াতেই শাস্তি দিন। আল্লাহ তা'আলা সেটি কবুল করেছেন ও দুনিয়াবাসীর শিক্ষার জন্য নিদর্শন হিসেবে সেভাবে রেখেছেন। যেন মানুষ যাদু নামক কুফ্রী থেকে বিরত থাকে। আর যদি 'মালাকাইনে (দু'জন ফেরেশ্তা)' বলা হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হলো আল্লাহ তা'আলা নিজ সৃষ্টি ফেরেশ্তাদ্বয়কে ইচ্ছা করেই এভাবে রেখেছেন যেন তাঁরা মানুষকে জাদুর বিষয়ে সঠিক তথ্য দিতে পারেন। এটি তাঁদের কোনো শাস্তির কারণে নয়। কারণ ফেরেশ্তারা কোনো অপরাধ করতে পারেন না। তাঁদের সে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টিই করা হয়নি। যেমনটি কুরআনের সূরা তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (রাহিমাহুল্লাহ-র) তার রচিত 'তাফসীরে রুহুল মাআনীতে' কাযী আয়ায (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন তাফসিরকারকরা হারুত মারুতের কাহিনিতে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার কোনো কিছুই রাসূল (ﷺ) থেকে সহীহ কিংবা দুর্বল কোনো সূত্রেই বর্ণিত হয়নি।

এছাড়াও ইমাম আশ-শিহাব আল-ইরাকী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেছেন, যে বিশ্বাস করবে যে, হারুত ও মারুত নামক দু'জন ফেরেশ্তাকে যোহরার সাথে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সে যেন মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফ্রী করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের সম্বন্ধে বলেছেন,

"তারা (ফেরেশ্তাগণ) আল্লাহর কোনো নির্দেশ অগ্রাহ্য করে না। আর তাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দেয়া হয় তাই তারা পালন করে।"[৬০]

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তারা অহংকার করে তাঁর বন্দেগী থেকে বিমুখ হয় না আবার ক্লান্ত ও হয় না। দিন রাত তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকে, বিশ্রাম নেয় না।"[৬১]

আর রাসূল (ﷺ) ও সাহাবীদের নামে তারা উক্ত তারাকে লানত করতেন বলে যে বর্ণনা এসেছে তা রাসূল (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা। রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস যারা তৈরি করে এটা তাদের কাজ।[৬২]

হারূত ও মারূত সম্পর্কে কুরআনে আর কোনো কিছুই বলা হয়নি। সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু এ বিষয়ক অনেক গল্প-কাহিনি হাদীস নামে বা তাফসির নামে তাফসীরের গ্রন্থগুলোতে বা সমাজে প্রচলিত। কাহিনিটির সার-সংক্ষেপ হলো– মানব জাতির পাপের কারণে ফেরেশ্তাগণ মহান আল্লাহকে বলেন, মানুষের এত অপরাধ আপনি ক্ষমা করেন কেন বা শাস্তি প্রদান করেন না কেন? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, তোমরাও মানুষের মতো প্রকৃতি পেলে এরূপ পাপ করতে। তারা বলেন, কক্ষনো না। তখন তারা পরীক্ষার জন্য হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশ্তাকে নির্বাচন করেন। তাদেরকে মানবীয় প্রকৃতি প্রদান করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তারা যোহরা নামক এক পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে মদ্যপান, ব্যভিচার ও নরহত্যার পাপে জড়িত হন। পক্ষান্তরে যোহরা তাদের কাছ থেকে মন্ত্র শিখে আকাশে উড়ে যায়। তখন তাকে একটি তারকায় রূপান্তরিত করা হয়।...

এ গল্পগুলো মূলত ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি। তবে কোনো কোনো তাফসির গ্রন্থে এগুলো হাদীস হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ক সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল বা জাল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বিভিন্ন সনদের কারণে কয়েকটি বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস সবগুলোই জাল বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা কুরতুবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস ও মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল গল্প ফেরেশ্তাগণ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য অনেক ধর্মে ফেরেশ্তাগণকে মানবীয় প্রকৃতির বলে কল্পনা করা হয়। তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্ত শক্তি আছে বলেও বিশ্বাস করা হয়। ইসলামী বিশ্বাসে ফেরেশ্তাগণ মানবীয় প্রবৃত্তি, নিজস্ব চিন্তা বা মহান আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রবৃত্তি থেকে পবিত্র। তাঁরা মহান আল্লাহকে কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা মহান আল্লাহর কোনো কর্ম বা কথাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এরূপ কোনো প্রকারের প্রকৃতি তাদের মধ্যে নেই। কাজেই এ সকল কাহিনি ইসলামী 'আক্বীদাহ্ বিরোধী। ❑

[৬০] *সূরা আত্ তাহ্রীম : ৬।*

[৬১] *সূরা আল আম্বিয়া- : ১৯-২০।*

[৬২] *তাফসীরে রুহুল মা'আনী- সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১০২।*

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

মুহার্‌রম মাসে যা কিছু বর্জনীয়

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশর : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : হিজরি সনের প্রথম মাস মুহার্‌রম। আমাদের সমাজে হিজরি সনের ১২ মাসকে কেন্দ্র করে অনেক আজগুবি, উদ্ভট মিথ্যা ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি দেখা যায়। এ সব ফযীলতের বর্ণনা দিয়ে হাদীস বানিয়েছে কাজ্জাব মিথ্যুকরা। প্রচলিত ‘বার চাঁদের ফযীলত’ জাতীয় গ্রন্থগুলো এ সব বাতিল কথায় ভরপুর। আমাদের মাঝে মুহার্‌রম মাস সম্পর্কিত যে সব কল্পকাহিনি প্রচলতি আছে তার কিছু নিম্নে আলোচনা করা হবে। তবে প্রথমে মুহার্‌রম সম্পর্কে কিছু সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হলো।

সহীহ হাদীসের আলোকে মুহার্‌রম মাস : সহীহ হাদীসের আলোকে মুহার্‌রম মাসের ফযীলত নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

❖ বছরের চারটি ‘হারাম’ মাস। যথা- মুহার্‌রম, রজব, যিলক্বাদ ও যিলহাজ্জ মাস। এ মাসগুলো ইসলামী শরিয়তে বিশেষভাবে সম্মানিত। এ মাসগুলোতে ঝগড়াঝাটি বা যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

“নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করো, যেমন- তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।”[৬৩]

[৬৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৬।*

❖ মুহার্‌রম মাসকে সহীহ হাদীসে ‘আল্লাহর মাস’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ মাসের নফল সিয়াম সর্বোত্তম নফল সিয়াম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.

“রামাযানের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হলো মহান আল্লাহর মাস মুহার্‌রম মাসের সিয়াম।”

❖ মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখ ‘আশূরা’র দিনে সিয়াম পালনের বিশেষ ফযীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আশূরার সিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

“এ দিনের সিয়াম গত এক বছরের পাপ মার্জনা করে।”[৬৪]

এ দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে সিয়াম পালন করতেন, তাঁর উম্মাতকে সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন এবং ১০ তারিখের সাথে সাথে ৯ বা ১১ তারিখেও সিয়াম পালন করতে উৎসাহ দিয়েছেন।[৬৫]

❖ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দিনে আল্লাহ তাঁর রাসূল মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সঙ্গী বানী ইসরা-ঈলকে ফিরআউনের হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং ফিরআউন ও তার সঙ্গীদেরকে ডুবিয়ে মারেন।[৬৬]

সহীহ হাদীস থেকে মুহার্‌রম মাস ও আশুরা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অনেক বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনি রচিত ও প্রচলিত হয়েছে। এখানে দু’টি বিষয় লক্ষণীয় :

প্রথমতঃ এ দিনটিকে ইহুদিগণ সম্মান করত এ কারণে যে, ইহুদিদের মধ্যে এ দিনটি সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত হিসাবে সেগুলো মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। প্রথম যুগের মুসলিমগণ এগুলো সত্য বা মিথ্যা বলে বিশ্বাস না

[৬৪] *সহীহ মুসলিম।*

[৬৫] *ইবনু রাজাব, লাতাইফ- ১/৬৮-৭৬; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ৯১-৯৪।*

[৬৬] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

করে ইসরাঈলী কাহিনি হিসাবেই বলেছেন। পরবর্তী যুগে তা 'হাদীসে' পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইন্তিকালের অর্ধ শতাব্দী পরে ৬১ হিজরির মুহার্‌রম মাসের ১০ তারিখে আশূরার দিনে তাঁর প্রিয়তম নাতি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন। এ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষের ও বিপক্ষের অনেক বিবেকহীন দুর্বল ঈমানের মানুষ 'আশূরার' বিষয়ে অনেক 'হাদীস' বানিয়েছে। কেউ দিনটিকে 'শোক দিবস' হিসেবে এবং কেউ দিনটিকে 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালনের জন্য নানা প্রকারের ভিত্তিহীন কল্পকথা তৈরি করছে। তবে মুহাদ্দিসগণের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে এ সব জালিয়াতি ধরা খুবই সহজ ছিল।

মুহার্‌রম ও আশূরা সম্পর্কে এ জাতীয় বহুলপ্রচলিত কথাবার্তাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি–

(১) যে সকল 'হাদীস' কোনো কোনো মুহাদ্দিস জাল বা বানোয়াট বলে উল্লেখ করলেও, কেউ কেউ তা দুর্বল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং যে সকল 'হাদীস' অত্যন্ত দুর্বল সনদে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যত ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব বলেছেন।

(২) সকল মুহাদ্দিস যে সকল হাদীসকে 'জাল' ও ভিত্তিহীন বলে একমত পোষণ করেছেন। এখানে আমরা প্রথম পর্যায়ের কিছু হাদীস ও মতামত উল্লেখ করছি–

◈ অত্যন্ত দুর্বলসূত্রে কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা আদম (আলাইহিস সালাম)-এর তাওবাহ্ কবূল করেন।

◈ অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ দিনে নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামে।

◈ অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এ দিনে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন।

◈ মুহার্‌রম মাসে বা আশূরার দিনে দান-সাদাক্বার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এ বিষয়ে কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য সূত্রে একজন সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আশূরার দিনে সিয়াম পালন করলে যেহেতু এক বছরের সাওয়াব পাওয়া যায়, সেহেতু এ দিনে দান করলেও এক বছরের দানের সওয়াব পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া এ দিনে দানের বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা।[৬৭]

◈ আশুরার দিনে ভালো খাওয়া-পরা সম্পর্কিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ سَنَتِهِ كُلِّهَا.

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে তার পরিবারের জন্য প্রশস্তভাবে খরচ করবে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরই সে ব্যক্তিকে প্রশস্ত রিয্ক প্রদান করবেন।"

উপর্যুক্ত হাদীসটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেকটি সনদই অত্যন্ত দুর্বল। বিভিন্ন সনদের কারণে বাইহাক্বী, ইরাকী, সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এ হাদীসটিকে 'জাল' হিসেবে গণ্য না করে 'দুর্বল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজ্‌র হাদীসটিকে 'অত্যন্ত আপত্তিকর ও খুবই দুর্বল' বলেছেন। অপরদিকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ প্রমুখ মুহাদ্দিস একে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক সনদই অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার ফলে একাধিক সনদে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় না। এছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীসের বিরোধী। সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদিরা আশূরার দিনে উৎসব-আনন্দ করে, অতএব তোমরা তাদের বিরোধিতা করবে, এ দিনে সিয়াম পালন করবে এবং উৎসব বা আনন্দ করবে না।[৬৮]

◈ আশূরার দিনে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে–

مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ بِالإِثْمِدِ، لَمْ تَرْمُدْ عَيْنُهُ أَبَدًا.

"যে ব্যক্তি আশূরার দিনে চোখে 'ইসমিদ' সুরমা ব্যবহার করবে কখনোই তার চোখ উঠবে না।"

---

[৬৭] *ইবনু রাজাব, লাতাইফ- ১/৭৮; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ৯৫-৯৬।*

[৬৮] *ইবনু তাইমিয়া, আহাদীসুল কুস্‌সাস- পৃ. ৭৯; ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ'আত- ২/১১৩-১১৭; সুয়ূতী, আল-লাআলী- ২/১০৯-২১৩; সাখাবী, আল-মাকাসিদ- পৃ. ৪২৭; আল-যারকশী, আত-তাযকিরা- ৩৪ ও ১১৮; ইবনু আররাক, তানযীহ- ২/১৫০-১৫৭; ইবনু রাজাব, লাতাইফ- ১/৭৯; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার- পৃ. ২৪৪-২৪৫; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/১৩২-১৩৩; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ১০০-১০২।*

উপরের হাদীসটির মতই এ হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক সনদই অত্যন্ত দুর্বল বা মিথ্যাবাদী রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। কোনো কোনো মুহাদ্দিস একাধিক সনদের কারণে হাদীসটিকে 'দুর্বল' হিসাবে গণ্য করলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে জাল ও বানোয়াট হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেন, ইমাম হুসাইনের হত্যাকারীগণ আশুরার দিনে সুরমা মাখার বিদ'আতটি চালু করেন। এ কথাটি তাদেরই বানানো। কোনো দুর্বল রাবী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করেছেন।[৬৯] *[সূত্র : হাদীসের নামে জালিয়াতি]*

মুহার্‌রম মাস বিষয়ক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা : মুহার্‌রাম মাস সম্পর্কিত নিচের কথাগুলো সকল মুহাদ্দিস একবাক্যে জাল বলে স্বীকার করেছেন। এগুলোকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। **প্রথমতঃ** মুহার্‌রাম বা আশুরার সিয়ামের ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা, **দ্বিতীয়তঃ** আশুরার দিনের বা রাতের জন্য বা মুহার্‌রম মাসের জন্য বিশেষ সালাত ও তার ফযীলতের বিষয়ে জাল কথা এবং **তৃতীয়তঃ** আশুরার দিনে অতীত ও ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে বলে জাল কথা।

১. মুহার্‌রাম বা আশূরার সিয়াম : আশুরার সিয়াম পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা– মর্মে সহীহ হাদীস আমরা দেখতে পেয়েছি। তবে হাদীস জালকারীগণ এ সম্পর্কিত আরো অনেক কথা বানিয়েছে। প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি।

হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি মুহার্‌রামের মাসে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ৩০ দিন রোযা রাখার সমান সওয়াব দিবেন। আরও হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি আশুরার দিন একটি রোযা রাখিবে সে দশ হাজার ফেরেশ্‌তার, দশ হাজার শহীদের ও দশ হাজার হাজীর সওয়াব পাইবে।

আরও হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে স্নেহপরবশ হয়ে কোনো ইয়াতীমের মাথায় হাত ঘুরাবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ইয়াতীমের মাথার প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে তাকে বেহেশ্‌তের এক একটি 'দরজা' প্রদান করিবেন। আর যে ব্যক্তি উক্ত তারিখের সন্ধ্যায় রোযাদারকে খানা খাওয়াবে বা ইফতার করাইবে, সে ব্যক্তি সমস্ত উম্মাতে মোহাম্মদীকে খানা খাওয়াবার ও ইফতার করাবার ন্যায় সওয়াব পাইবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বললেন, যে ব্যক্তি আশুরার তারিখে রোযা রাখিবে, সে ৬০ বছর রোযা নামায করার সমতুল্য সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি ঐ তারিখে বিমার পোরসী করবে, সে সমস্ত আওলাদে আদমের বিমার-পোরসী করার সমতুল্য সওয়াব পাবে।... তার পরিবারের ফারাগতি অবস্থা হবে। ৪০ বছরের গুনাহর কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে...।[৭০]

অনুরূপ আরেকটি মিথ্যা কথা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মুহার্‌রাম মাসের প্রথম ১০ দিন রোযা রাখেবে, সে ব্যক্তি যেন ১০ হাজার বছর যাবত দিনের বেলা রোযা রাখল এবং রাত্রিবেলা 'ইবাদতে জাগরিত থাকল।... মুহার্‌রম মাসে 'ইবাদতকারী ব্যক্তি যেন ক্বদরের রাত্রির 'ইবাদতের ফযীলত লাভ করল।... তোমরা আল্লাহর পছন্দনীয় মাস মুহর্‌রমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। যেই ব্যক্তি মুহার্‌রম মাসের সম্মান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের মধ্যে সম্মানিত করবেন এবং জাহান্নামের 'আযাব হতে বাঁচিয়ে রাখবেন... মুহর্‌রমের ১০ তারিখে রোযা রাখা আদম (আলাইহিস সালাম) ও অন্যান্য নবীদের উপর ফর্‌য ছিল। এই দিবসে ২০০০ নবী জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ২০০০ নবীর দু'আ কবুল করা হয়েছে...।"[৭১] মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এগুলো সবই বানোয়াট কথা ও জাল হাদীস।[৭২]

২. মুহার্‌রাম মাসের সালাত : মুহার্‌রম মাসের কোনো দিনে বা রাতে এবং আশুরার দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের প্রকার নির্দেশনা বা উৎসাহ কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ক সকল কথাই বানোয়াট।

---

[৬৯] *ইবনুল জাওযী, আল-মাওদূ'আত- ২/১১৬; সুয়ূতী, আল-লাআলী- ২/২১১; সাখাবী, আল-মাকাসিদ- পৃ. ৪০১; ইবনু আররাক, তানযীহ- ২/১৫৭; ইবনু রাজাব, লাতাইফ- ১/৭৯; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার- পৃ. ২২২; মাসনূ- পৃ. ১৪১; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/১৩১-১৩২; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ১০০-১০২।*

[৭০] *মাও. গোলাম রহমান, মকসুদোল মু'মিনীন- পৃ. ৪৩০-৪৩১। পুনশ্চঃ মুফতী হাবীব সামদানী, বারো চান্দের ফযীলত- পৃ. ১৩; অধ্যাপিকা কামরুন নেসা দুলাল- পৃ. ২৯৮-৩০০।*

[৭১] *মুফতী হাবীব সামদানী, বারো চান্দের ফযীলত- পৃ. ১৩।*

[৭২] *ইবনুল জাওযী, আল-মাওদূ'আত- ২/১১২-১১৭; সুয়ূতী, আল-লাআলী- ২/১০৮-১০৯; ইবনু আর্‌রাক, তানযীহ- ২/১৪৯-১৫১; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার- পৃ. ২৯৪; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/১২৯-১৩০; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ৯৪-৯৫।*

আমাদের দেশে প্রচলিত কোনো কোনো পুস্তকে মুহার্‌রাম মাসের ১ম তারিখে দুই রাকআত সালাত আদায় করে বিশেষ দু'আ পাঠের বিশেষ ফযীলতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৭৩] এগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৩. আশুরার দিনে বা রাতে বিশেষ সালাত : আশুরার সিয়ামের উৎসাহ দেওয়া হলেও হাদীসে আশুরার দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ সালাত আদায়ের বিধান দেওয়া হয়নি। তবে হাদীস বিকৃতিকারীরা অনেক কথা বানিয়েছে। যেমন- যে ব্যক্তি আশুরার দিন যোহর ও 'আসরের মধ্যবর্তী সময়ে... অথবা আশুরার রাতে এত রাকআত সালাত অমুক অমুক সূরা এতবার পাঠ করে আদায় করবে... সে এত পুরস্কার লাভ করবে। সরলপ্রাণ মুসলিমদের মন জয় করার জন্য হাদীস বিকৃতিকারীরা এ সকল কথা বানিয়েছে, যা অনেক সময় সরলপ্রাণ 'আলেম ও বুযুর্গকেও ধোঁকা দিয়েছে।[৭৪]

৪. আশুরায় অতীত ও ভবিষ্যত ঘটনাবলীর বানোয়াট ফিরিস্তি : মিথ্যাবাদীরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে জালিয়াতি করে যা কিছু বলেছে তা নিম্নরূপ–

◈ আশুরার দিনে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী... সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি লাওহে মাহফুজ সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি আরশ সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি আরশের উপরে সমাসীন হয়েছেন। ◈ এ দিনে তিনি কুরসী সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি ফেরেশ্‌তাগণকে সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি আদম (আলাইহিস সালাম)-কে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। ◈ এ দিনে তিনি ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-কে আসমানে উঠিয়ে নেন। ◈ এ দিনে তিনি নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-কে নৌকা থেকে বের করেন। ◈ এ দিনে তিনি দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর তাওবাহ্ কবুল করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি সুলাইমান (আলাইহিস সালাম)-কে রাজত্ব প্রদান করেছেন। ◈ এ দিনে তিনি আইয়ুব (আলাইহিস সালাম)-এর বিপদ-মুসিবত দূর করেন। ◈ এ দিনে তিনি তাওরাত নাযিল করেন। ◈ এ দিনে ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করেন... খলীল উপাধি লাভ করেন। ◈ এ দিনে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পান। ◈ এ দিনে ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-কে কুরবানী করা হয়েছিল। ◈ এ দিনে ইউনূস (আলাইহিস সালাম) মাছের পেট থেকে বাহির হন। ◈ এ দিনে আল্লাহ তা'আলা ইউসূফ (আলাইহিস সালাম)-কে জেলখানা থেকে বের করেন। ◈ এ দিনে ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। ◈ এ দিনে ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) ইউসূফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সম্মিলিত হন। ◈ এ দিনে মুহাম্মদ (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছেন। ◈ এ দিনে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...।

কেউ কেউ বানিয়েছে– মুহাররমের ২ তারিখে নূহ্ (আলাইহিস সালাম) প্লাবন হতে মুক্তি পেয়েছেন, ৩ তারিখে ইদরীস (আলাইহিস সালাম)-কে আসমানে উঠানো হয়েছে, ৪ তারিখে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ অগণিত ঘটনা এ মাসে বা এ দিনে ঘটেছে এবং ঘটবে বলে উল্লেখ করেছে হাদীস বিকৃতিকারীরা– তাদের এ সকল কল্প কাহিনিতে। মোটকথা, আশুরার দিনে মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সাথীদের মুক্তি পাওয়া ছাড়া আর কোনো ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আদম (আলাইহিস সালাম)-এর তাওবাহ্ কবূল, নূহ্ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকা জূদী পর্বতের উপর থামা ও 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) জন্মগ্রহণ করার কথা অনির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী থেকে বর্ণিত। আশুরা বা মুহার্‌রাম সম্পর্কে আর যা কিছু বলা হয় সবই মিথ্যা ও বাতিল কথা। দুঃখজনক হলো– আমাদের সমাজে মুহার্‌রম বা আশুরা বিষয়ক বই পুস্তকে, আলোচনা ও ওয়াযে এ সমস্ত ভিত্তিহীন কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়।[৭৫]

আল্লাহ আমাদেরকে এ জাতীয় জাল, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা ও 'আমল থেকে হিফাযত করুন– আমীন। ❑

---

[৭৩] *মুফতী হাবীব সামদানী, বারো চান্দের ফযীলত- পৃ. ১১-১২; অধ্যাপিকা কামরুন নেসা দুলাল, নেক কানুন- পৃ. ২৯৮।*

[৭৪] *ইবনুল জাওযী, মাওদূ'আত- ২/৪৫-৪৬; সুয়ূতী, লাআলী- ২/৫৪; ইবনু আর্‌রাক, তানযীহ- ২/৮৯; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ১/৭৩; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ৯০, ১১০-১১১।*

[৭৫] *ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ'আত- ২/১১২-১১৭; ইবনুল কাইয়িম, আল-মানার- পৃ. ৫২; যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল- ২/১৯০; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান- ২/১৬৯; সুয়ূতী, আল-লাআলী- ২/১০৮-১০৯; ইবনু আর্‌রাক, তানযীহ- ২/১৪৯; মোল্লা ক্বারী, আল-আসরার- পৃ. ৩০০; আব্দুল হাই লাখনবী, আল-আসার- পৃ. ৯৪-৯৭; দরবেশ হূত, আসনাল মাতালিব- পৃ. ২৭৭-২৭৮; আজলূনী, কাশফুল খাফা- ২/৫৫৭।*

৬৫ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ২৪ জুন- ২০২৪ ঈ. ❖ ১৭ যিলহাজ্জ- ১৪৪৫ হি.

স্মৃতিচারণ

প্রফেসর ড. এম. এ বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) আমার দেখা কীর্তিমান দেউটি

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

[দ্বিতীয় পর্ব]

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যুগে যুগে এই পৃথিবীতে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য মনিষীদেরকে প্রেরণ করেছেন। এটা তাঁরই একটি বড় নিয়ামত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মনে করি আল্লামা ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) স্যার উল্লেখ যোগ্য মনিষীদের একজন। কারণ স্যারের জীবনী পড়লে বা জানলে মনে হয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সকল ক্ষেত্রে নিয়ামত ভরে দিয়েছেন যেটি তাঁর জন্ম, মেধা এবং কর্ম সম্পর্কে জানলে অনুমান করা যায়।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : ১৯২৯ সালে এদেশে যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। বিশেষ করে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারত ছাড় ছাড়তে হবে এই বজ্রধ্বনি। তখন উর্দু পত্রিকা “দৈনিক যামানা”র সম্পাদক ছিলেন মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক মরহুম মাওলানা আল্লামা আকরাম খাঁ (রাহিমাহুল্লা-হ)। আর আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) ছিলেন তার নায়েব সম্পাদক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা লেখায় মাওলানা আকরাম খাঁকে আলীপুরে জেলে বন্দী করলে আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) সাহেব ঐ “দৈনিক যামানা” পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি নিজস্ব মালিকানায় “সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী” পত্রিকা বের করেন। কিন্তু শাসককুল তাঁকেও এক বছরের জন্য আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ করে। ঠিক ঐ সময়ে ১৯৩০ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর তারিখে বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সৈয়দপুর গ্রামে নানার বাড়ীতে এ বিরল এবং অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী মনীষী ড. আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল বারী জন্ম গ্রহণ করেন। পিতৃকুলে তিনি ছিলেন সৈয়দ বংশের আর মাতৃকুলের দিক থেকে ছিলেন কুরাইশ বংশের। ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী’র পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী ইবনু আব্দুল হাদী ইবনু রাহাত আলী ইবনুল বাকের আলী ইবনু আদম বারিহা (বড় আদম লস্কর) ইবনু বুরহান মজলিশ। তাঁর পিতা-পিতৃব্য উভয়েই শুধু বাংলা নয় সারা ভারত বর্ষে যশস্বী কি রাজনীতিতে, কি সাহিত্যে কি বক্তৃতায়, কি ধর্মীয় পাণ্ডিত্যে। এ পরিবারটা যেন আঁধার রাতে নক্ষত্র মালায় প্রোজ্জ্বিল পথিকের চলার পথের দীপ্তি।

এ বিখ্যাত পরিবারের কিঞ্চিত বর্ণনা প্রাসঙ্গিক প্রদান করা হলো মরহুম মোহাম্মদ আব্দুল বারী স্যারের পিতামহ সৈয়দ আব্দুল হাদী ছিলেন সত্যিকার অর্থে হিদায়াতের নিশান নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এক নির্ভীক সংস্কারক আর মুবাল্লিগে দ্বীন। তাঁর তিন পুত্র ছিলেন, যথাক্রমে– (১) মোহাম্মদ ‘আব্দুল্লাহেল বাকী, (২) মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, (৩) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী। উল্লেখ্য মোহাম্মদ আব্দুস সালাম অল্প বয়সেই মারা যান। আর আব্দুল্লাহেল কাফী সাহেব চিরকুমার ছিলেন তবে তিনি সারাটি জীবন দ্বীন ও মিল্লাতের জন্য আত্ম-নিবেদিত এক নির্ভীক সৈনিক হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন। ১৯৬০ সালের ৪ জুন তিনি ইন্তেকাল করেন। আর মরহুম সৈয়দ আব্দুল হাদী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহিল বাকী (রাহিমাহুল্লা-হ)’র তিনটি পুত্র ছিলেন, যথাক্রমে– (১) ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী, (২) ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, (৩) মোহাম্মদ আব্দুল হাদী মুহাম্মদ আনোয়ার। উল্লেখ্য ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী সাহেবের দাদা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল হাদী যখন ভারতের বর্ধমান জেলার রসুলপুর পরগনার টুবটুর গ্রামে উপনীত হন তখন তাঁর যোগ্যতা, মনীষা, তাক্বওয়া পরহেজগারী এবং বিদ্যাবত্তার প্রভাব অনেককে আকর্ষণ করল ঐখানকার আধ্যত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন শাইখ দিরাসাতুল্লাহর পৌত্রী উম্মে সালমার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। আল্লামা আব্দুল হাদীর ঐ শ্বশুরকুল ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র বংশধর। এ জন্যই মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লা-হ) স্যার ছিলেন মাতৃকুলে কুরাইশ বংশের।

****সহকারী অধ্যাপক***, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও **খতীব**, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

ছাত্রজীবন : প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন পৈতৃক নিবাস নূরুল হোদা গ্রামের জুনিয়র মাদ্‌রাসায় ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যায়ন করেন। অতঃপর তিনি নওগাঁ কো-অপারোটভ হাই মাদ্‌রাসায় ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেই তিনি ১৯৪৪ সালে মাত্র ১৩ বছর ৬ মাস বয়সেই অবিভক্ত বাংলায় প্রথম বিভাগে একাদশ স্থান অধিকার করে হাই মাদ্‌রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাই মাদ্‌রাসা পাস করার পর তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল ইসলাম কলেজ) ভর্তি হন এবং ১৯৪৬ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও ১৯৫০ সালে একই বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্স ও মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানে তাঁর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দুই বিশ্ব বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ. এ. আর গিব এবং প্রফেসর যোসেফ শাখত্। তিনি কিছুকাল আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেন। ১৯৬১ সালে নাফিল্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশীপ লাভ পূর্বক লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে করেন Post doctorat Research।

আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র শিক্ষা জীবনে মেধাবী ছাত্রের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেন। যেমন-

(১) ১৯৪৬ সালে তৎকালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সারা বাংলায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

(২) ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি সাহিত্য অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষায় সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সমস্ত বিষয়ের অনার্স পরীক্ষার্থীদের টপকিয়ে তিনি হলেন শুধু প্রথম শ্রেণীতে ১ম নন সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র। যা এই বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম। আর এ বিজয়ের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সংবর্ধিত করলো নীলকান্ত স্বর্ণপদকসহ দু'টি স্বর্ণপদক দিয়ে।

(৩) ১৯৫০ সালে এম. এ পরীক্ষায় ও প্রতিভা একইভাবে চমক সৃষ্টি করে আরও একটি স্বর্ণ পদকে ভূষিত হলেন।

(৪) উল্লেখ্য তিনি অনার্সে আরবীর ছাত্র হয়েও ইংরেজী সাহিত্য সাবসিডিয়ারী হিসেবে পাঠ করে ডিসটিংশন পেয়েছিলেন। ফলে বাংলা, আরবী এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁর দখল ছিল অবিশ্বাস্যরূপে।

(৫) তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ওবায়দুল্লাহ মেমোরিয়াল পদক প্রাপ্ত হন।

(৬) তিনি বাহরুল উলুম উবায়দী সৌহরাওয়ার্দী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

(৭) ১৯৬৯ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক ও লাভ করেন।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র কর্মজীবন : ড. মোহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ)'র কর্মময় জীবন সম্পর্কে লিখতে গেলে এক কথায় বলা যায় তাঁর কর্মজীবন ছিল চিত্তাকর্ষক ফুলে পরিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ইংরেজীতে একটি উক্তির কথা স্মরণ হচ্ছে সেটি হলো– "The world will judge you by your deeds. They may be flowers, fair or weeds."
প্রকৃতপক্ষে তাঁর কর্মময় জীবন ছিল সুন্দর, মুগ্ধকর ফুলের মতো যা আজও সুবাস ছাড়াচ্ছে। শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়নে একজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে সক্ষম থাকা পর্যন্ত তিনি এ লক্ষেই সারাটি জীবন কাজ করে গেছেন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে অত্যন্ত তরুণ বয়সে ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সার্ভিসে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা সরকারি কলেজে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজশাহী সরকারি কলেজে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনা করেছেন। কর্ম জীবনের প্রথমেই তিনি সরাসরি অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এটি ও ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রাহিমাহুল্লাহ) স্যারের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ কলেজের চাকরিতে প্রথমেই লেকচারাল বা সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ঢোকাই স্বাভাবিক নিয়ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় ১৯৫৬

সালের অক্টোবর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের "রিডার" (সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের এক মাস পর অর্থাৎ- নভেম্বর মাসে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও কৃষ্টি বিভাগে প্রথম বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ লাভের সুযোগ ও তিনিই পেয়েছিলেন। স্যারের নিরলস সাধনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বিচক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অন্যতম বিভাগে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালে তিনিই এ বিভাগের প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী স্যার তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষক হিসেবে (Pride of Performance) প্রেসিডেন্টের স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ) স্যার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক পদে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষার উপর স্যারের অসামান্য দখল থাকার কারণে ১৯৬৩-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভাষা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্যার ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত কলা অনুষদের ডিন হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন জিন্নাহ হলের প্রভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬২-১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউনসিলের সদস্যও ছিলেন। ১৯৬৩-১৯৬৪ ও ১৯৬৯-১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য এবং ১৯৭৭-১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, সিনেট এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চান্সেলর পদে ১৯৭০ সালের ১৯ জুলাই তারিখে মাত্র ৪০ বছর বয়সে নিয়োগ লাভ করেছিলেন এবং উক্ত পদে ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ৭ জুলাই তারিখে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইচ-চান্সেলর হিসেবে ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটি নিসন্দেহে তাঁর উক্ত পদের দায়িত্ব পালনে সফলতার একটি বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৭ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৮৫ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮১-১৯৮৯ সালে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে বিশ্ববিদ্যালয় মাঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও স্যার সুনামের সাথে পালন করেছেন। ১৯৮৯-১৯৯২ সালে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টাও ছিলেন। ১৯৯২-১৯৯৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রুপকার ও প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবেও নিযুক্ত হন। ১৯৯০ সালে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি ১৭টিরও অধীক দেশ-বিদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

২৩টিরও অধীক দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অথবা সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ছোটদের ইসলামী বিশ্বকোষ এর চেয়ারম্যানও ছিলেন।

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ) স্যারের জন্মই হয়েছে মনে হয় উচ্চ শিক্ষার শিখরে আরোহণের জন্য। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ঐ উচ্চাসনে সমাসীন থেকে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। হিমালয়ের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ ছিলেন স্যার অথচ সর্বদা ন্যায় সরল ও স্নেহময়ও ছিলেন। আকাশের মতো উদার সমীরনের ন্যায় ব্যবহার, মেঘমালার ন্যায় শত্রু-মিত্র সকলের ছায়াদান আবার নীতির প্রশ্নে পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। জীবনে স্বচ্ছতা, শৃংখলা ও কর্তব্যে সচেতন আর উদ্যোগী, উদ্ভাবনী কর্মেই যেন নতুন নতুন দায়িত্ব সৃষ্টিতে সর্বদা কর্মচঞ্চল। এ জন্য দেশের সর্বোচ্চ পদ থেকে সর্বনিম্ন পদ পর্যন্ত চাকরির জীবনে সকলেই অবসর ভোগ করেন। কিন্তু স্যারের জীবনে মৃত্যুই ছিল শেষ অবসর। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরা : উন্নয়ন ও উন্নয়নের ঝুঁকি

–মো. আরিফুর রহমান*

অনেক দিন ধরে প্রিয় ‘সাপ্তাহিক আরাফাতে’ লিখিনি। এর কারণ হলো আমি শিক্ষা সংক্রান্ত লেখালেখি করতাম। বিগত আট মাস ধরে এই কাজের বাইরে রয়েছি। এখন আমার কাজ জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলের মানুষের অভিযোজন কৌশল, ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের ক্ষমতায়ন, গুড গভর্নেন্স ইত্যাদি। আমি লিখিনি, কারণ এই বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছি। চর্চার অভাবে প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বিগত প্রায় এক বছর ধরে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে বাস্তবে কাজ করছি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। এখন মনে হচ্ছে এই সম্পর্কে লিখতে পারবো ইন্‌শা-আল্লাহ। বিগত আটমাস আমার কর্মস্থল ছিল একেবারে সুন্দরবনের কোলঘেঁষে। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থার একটি প্রজেক্টে কোঅর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করেছি। সম্প্রতি আর একটি জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন সংস্থার ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট-এর কোঅর্ডিনেটর হিসাবে যোগদান করলাম।

আমরা আজ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরার কথা জানবো। গাবুরার দুঃখ, গাবুরার মানুষ, এর চলমান উন্নয়ন এবং এর সার্বিক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করবো। গবেষকের চোখে নয়, সাদামাটা চিন্তায় আমরা সেগুলো দেখার প্রয়াস পাবো ইন্‌শা-আল্লাহ!

আমরা এই লেখাটির শুরুতে এক নজরে গাবুরা ইউনিয়ন পরিষদের নানান তথ্য দেখে নিই। এর দক্ষিণে সুন্দরবন, পূর্বে কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশি ইউনিয়ন এবং উত্তর ও পশ্চিমে খোলপেটুয়া নদী এবং উত্তর দক্ষিণে সেই বিখ্যাত কপোতাক্ষ নদ। গাবুরার আয়তন ৩৩বর্গ কি.মি.। এখানে ১৫টি গ্রাম রয়েছে। মৌজা ৪টি, ডাকঘর ৩টি, হাট রয়েছে ৩টি। গাবুরার লোক সংখ্যা ৩৮,৮২৫ জন। সরকারি ও বেসরকারি ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ইউনিয়নটিতে। এখানে রয়েছে ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাদ্রাসা। মসজিদ আছে ৫৩টি। এখানে পাকা রাস্তা নেই বললেই চলে। মাত্র ২ কিলোমিটার সিমেন্ট দিয়ে ঢালাই করা পাকা রাস্তা রয়েছে এখানে যার অধিকাংশ ভাঙাচোরা। তবে কাঁচা রাস্তা আছে প্রায় ৭০ কিলোমিটার। গাবুরা ইউনয়নের পরিবার সংখ্যা ৭,৪৯১। তবে পরিবার ও জনসংখ্যার তথ্য নিয়মিত পরির্তিত হয়। মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে গাবুরার বাইরে থাকে। বিশেষ করে শীতকালে ও বর্ষকালে জনসংখ্যার পার্থক্য দেখা যায়। এখানে এখন মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাস্তাঘাট পুরোটাই চলাচলের অনুপযোগী। নদীপথ হলো গাবুরা যাবার সব থেকে সহজ উপায়। তবে গাবুরা ইউনিয়নের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার উপায় হলো মটরসাইকেল ও পায়ে হেঁটে যাওয়া। ভ্যান, রিক্সা বা অন্যান্য যানবাহন এখানে নেই বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, দোকানপাট ও অন্যান্য স্থাপনা। ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় রেমালে ১০০টি বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে গেছে, আংশিক ভেঙেছে ৩৫০টি, অন্তত একজন মারা গিয়েছে, ২০০ একর মৎস্য ঘের প্লাবিত হয়েছে, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নষ্ট হয়েছে ১২০টি। তবে জেনে রাখা ভালো এ সব তথ্যে কিছুটা কম বেশি করা হতে পারে।

আগেই বলেছি, সাতক্ষীরা শ্যামনগর উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল ইউনিয়ন হওয়া সত্ত্বেও গাবুরার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যোগাযোগব্যবস্থা। রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত জরাজীর্ণ বেড়িবাঁধ দিয়ে চলতে গেলে গা শিউরে ওঠে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য

* লেখক, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, উত্তরণ।

সরকার মেগা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বেঁড়িবাধ নির্মিত হচ্ছে, খাল খনন হচ্ছে। সরকারের পাশাপশি এখানে শত শত দেশি, বিদেশি ও স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে উন্নয়নের জন্য। কেউ কাজ করছে গাবুরার অধিবাসীদের স্বাবলম্বী করতে, কেউ দক্ষতা উন্নয়ন করতে, কেউ অধিকার আদায়ে, কেউ সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করতে। এরই মধ্যে কেউ কেউ কাজ করছেন ঋণ বিতরণ নিয়ে। এই ঋণ নিয়ে মানুষ জঙ্গলে যায়, ঘর উঠায়, ইট ভাটায় কাজ করতে বাইরে যায় এর ফলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেকেই ঋণজালে আটকিয়ে পড়ছে। আর এর পাশাপাশি রয়েছে আর একটা ভয়ানক চিত্র। সেটা হলো মহাজনি সুদে কারবার। অনেকেই এই ইউনিয়নে এবং এর পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নগুলোতে উচ্চসুদে টাকা ধার দেয়। সুদের এই গল্পগুলো মারাত্মক ও ভয়ানক। এই সমস্ত গল্প মানুষ যখন আমাদেরকে বলে আমি অবাক হয়ে যাই। ঋণ নিয়ে পুরুষেরা জঙ্গলে যায়-মধু সংগ্রহে, চিংড়ি ও কাঁকড়া ধরতে, গোলপাতা কাটতে। অনেকে আর কখনো ফিরে আসে না। বাঘের আক্রমণের শিকার হয় অনেকে। তাদের স্ত্রীরা 'বাঘবিধবা' হয়। সমাজ ও দরিদ্রতার ভয়ানক ছোবলে পড়ে বাকি জীবন কাটে অসহনীয় যন্ত্রণায়। বাঘবিধবাদের গল্পগুলো অনেক নির্মম। আল্লাহ রহম করুন! এ বিষয়ে পরবর্তিতে লেখার আশা রেখে দিলাম।

শ্যামনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরার জীবন্ত সমস্যা টেকসই বেড়িবাঁধের অভাব। গাবুরার দক্ষিণ-পশ্চিমে খোলপেটুয়া নদী, তার উত্তর-দক্ষিণে কপোতাক্ষ নদ, দ্রুত বাঁধ সংস্কার না হলে মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে পারে সাতক্ষীরার দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরা। শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়, এখানে প্রয়োজন টেকসই বেড়িবাঁধ, রাস্তা এবং দুর্যোগে আশ্রয়ের জন্য মানসম্মত আশ্রয়কেন্দ্র। মানুষ বাড়ি ঘর ফেলে আশ্রয়কেন্দ্রে যেত চায় না। এ কারণে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে, 'একটি বাড়ি, একটি শেল্টার' বা 'আমার ঘর, আমার আশ্রয়' এই নীতি গ্রহণ করে অবহেলিত এই গাবুরাবাসীর জন্য সরকার ও বিশ্ববাসী প্রকল্প হাতে নিতে পারে। এখন আমরা আলোচনা করবো গাবুরার উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ।

বেসরকারি ও সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব : শ্যামনগর অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো না। বিশেষকরে গাবুরা মানুষজন ২০০৯ সালে ২৬ মে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'র পর থেকে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে। আইলার আঘাতে গাবুরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষ, গবাদি পশু, বাড়িঘর একবারে ধ্বংশযজ্ঞে পরিণত হয়। বিশ্বমিডিয়ার নজর পড়ে গাবুরায়। সাথে সাথে উন্নয়ন সংস্থাগুলো মানবিক প্রয়োজনে গাবুরাসহ আশপাশের ইউনিয়নগুলোতে বিভিন্ন সহযোগিতা শুরু করে। বিশ্বের অনেক উন্নয়ন সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের শত শত সংস্থা এখানে কাজ করতে থাকে। উন্নয়নের স্ট্রাটেজিতে গাবুরাবাসীর জীবনচেতনা পাল্টাতে থাকে। সাথে সাথে সরকারি প্রতিনিধিরাও পাল্টাতে থাকে। জনগণ ও সরকারি কর্মকর্তাদের নেতিবাচক পরিবর্তন এক সুদূরপ্রসারী ক্ষতি করে দিয়েছে এখানকার জনজীবন, উন্নয়নসংস্থাগুলো ও সংশ্লিষ্টদের। সরকারি প্রতিনিধিরা উন্নয়ন সংস্থাগুলোর নিকট থেকে কিছু প্রত্যাশা করে তা না হলে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করেন না। এর ফলে যা হলো তা উন্নয়ন সংস্থাগুলো এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে অলিখিত একটা দূরত্ব তৈরি হলো। ব্যাপক সংখ্যক উন্নয়ন সংস্থার কাজ মনিটরিং করা সহজ না। সমন্বয়ের অভাবে একই ব্যক্তি বার বার সহযোগিতা পেতে থাকলো। অনেকে মোটে পাচ্ছে না। এই অবস্থা একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করলো। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সমন্বয় করে কাজ না করলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

জনপ্রতিনিধিদের অনাগ্রহ : আমি গাবুরার অনেক গ্রাম, অনেক পাড়া, বাড়ি ঘুরেছি। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের সাথে কথা বলেছি। তারা প্রায়ই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। জনপ্রতিনিধিরা বাঁধ রক্ষা নয় ভাঙতে ইচ্ছুক-এমনটি তারা আমাকে জানিয়েছেন। নদীর বাঁধ ভেঙে গেলে

গ্রাম প্লাবিত হবে। সরকারি সাহায্য আসবে। এনজিওগুলোর সাহায্য আসবে। তা থেকে জনপ্রতিনিধিদের লাভবান হবার একটা সুযোগ থাকে। গাবুরা এমন অবহেলিত যে গতবার যিনি ঐ শ্যামনগরের সংসদ সদস্য ছিলেন তিনিও কখনো গাবুরায় যাননি তার পদে থাকাকালীন। চিন্তা করুন তাহলে! এনজিওগুলোর কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ভীষণ নেতিবাচকভাবে হস্তক্ষেপ করে। কাকে সুবিধাভোগী নির্বাচিত করতে হবে, কে সহযোগিতা পাবে তাও স্থানীয় ইউপি সদস্যরা তালিকা করে দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের কথা না শুনলে এনজিওগুলো প্রত্যাশানুযায়ী কাজ করতে পারে না। এই কারণে অনেক দাতাগোষ্ঠী গাবুরাতে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

রাজনৈতিক মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব : এই প্রত্যন্ত দ্বীপে রয়েছে রাজনৈতিক কোন্দলের ভয়াল থাবা যা সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘের থাবার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। সাহায্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রেও জনপ্রতিনিধিরা রাজনৈতিক আদর্শ বিবেচনা করে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। এই রাজনৈতিক কোন্দল এতটাই মারাত্মক যে, ইউনিয়ন পরিষদের অনেক সদস্য মাসের পর মাস পরিষদে যান না। সভায় অংশগ্রহণ করেন না। অথচ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এলাকার উন্নয়নের ইউপি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কথা। রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে গাবুরার উন্নয়নে ছিদ্র থেকে যাচ্ছে। এই ছিদ্র বন্ধে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষের নেতিবাচক প্রবণতা : গাবুরা দ্বীপের মানুষ কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে পরিশ্রমী। ঘূর্ণিঝড় আইলা, সিডর-এর পর ধীরে ধীরে এই দ্বীপের অনেকের মধ্যে চতুরতা ভর করে। এই দ্বীপের অধিবাসীদের অনেকের একের অধিক জাতীয় পরিচয়পত্র রয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। সবগুলো পরিচয়পত্র কিন্তু আসল নয়। এর কারণ হলো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা থেকে একই ব্যক্তির বার বার সহযোগিতা প্রাপ্তির আশা। এবং এভাবে তাদের অনেকেই ছলচাতুরি করে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সহযোগিতা বা ঋণ গ্রহণ করছেন। অনেকেই এ ঋণ নিয়ে আর পরিশোধ করেন না। পালিয়ে যান। বাড়ির ঠিকানায় পাওনাদাররা খুঁজতে আসলে দেখা যায়, ঠিকানা নকল। অনেকেই চড়া সুদে ঋণ দেয়, বাধ্য হয়ে দরিদ্রক্লিষ্ট মানুষগুলো ঋণ গ্রহণ করে। সময়মতো সুদসহ পরিশোধ করে, পরিশোধ না করতে পারলে সুদ চলতে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে। যে মানুষগুলো হিংস্র বাঘের সাথে, সাইক্লোন, লবণক্তারা সাথে সংগ্রাম করে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে তাদের বর্তমান এই করুণদশা আমাদেরকে মর্মাহত করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা : গাবুরা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। নৌকা পার হয়ে এই দ্বীপে যেতে হয়। উন্নয়ন প্রচেষ্টা এখানে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। আপনি চিন্তা করতে পারেন সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের যুগেও এখানে রয়েছে মাত্র ১.৫-২ কিলোমিটারের মতো পাকা রাস্তা! হাতে গোনা কয়েকটি পাকা বাড়িঘর রয়েছে। দ্বীপে প্রবেশ করে হেঁটে হেঁটে গাবুরার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে রয়েছে জটিলতা। মামলা চলছে কোথায় হবে ইউনিয়নের নতুন ভবন তা নিয়ে। অথচ বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এই দ্বীপে সব থেকে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও সেবা নিশ্চিত করার প্রয়োজন কারণ এখানকার মানুষ সব থেকে দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকে। আছে লবণক্তার বিষাক্ত ছোবল, খাবার পানির তীব্রতর সংকট। এই দ্বীপটা রাজনৈতিক সংকটের বাইরে রাখা দরকার।

বিভিন্ন ঝুঁকি গাবুরাবাসীর জীবনকে বিপন্ন করে রেখেছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বার বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার গাবুরার মানুষকে অন্তত রাজনৈতিকভাবে নিরাপদ রাখা দরকার। তাদের জন্য টেকসই বেড়িবাধ নির্মিত হচ্ছে, মেগা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে-এগুলো যেন টেকসই হয় সে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। দায়িত্বশীলতার সাথে সরকার এগুলো মনিটরিং করবে-এই প্রত্যাশা। ❑

মহিলা জগৎ

নারীদের পর্দাহীনতার কারণ

–এ.টি.এম. আহমাদ★

যত দিন যাচ্ছে আমাদের দেশের নারীরা তত বেশি বেপর্দা হয়ে পড়ছে। স্বামী নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না স্ত্রীকে, পিতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কন্যাকে, ভাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বোনকে। নারীদের এত বেপর্দা হওয়ার কারণ কি? বিষয়গুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর মূল কারণসমূহের অন্যতম হচ্ছে– **১.** বিশ্বব্যাপী ইহুদি নাসারাদের আধিপত্য, **২.** আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য মেনে না নেয়া, **৩.** শয়তানের প্ররোচনা, **৪.** ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা।

১. বিশ্বব্যাপী ইহুদি-নাসারাদের আধিপত্য : সারা বিশ্বকে আজ তারা কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক সব কিছুতেই নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইহুদি-নাসারাদের এই নেতৃত্ব অন্যান্য ভোগবাদী সমাজ সভ্যতার মতো আমাদের নারীদেরকেও আকৃষ্ট করেছে। আমাদের নারীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ঢংকে সভ্যতার চূড়ান্ত পরিণতি মনে করায় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তাদের অপসংস্কৃতিকেও জীবনের পরম পাওয়া মনে করছে। ফলশ্রুতিতে ইসলামী নির্দেশনাকে ব্যাক ডেটেড আখ্যা দিয়ে তারা আধুনিক সভ্যতার নামে বিজাতীয় সভ্যতাকে লুফে নিয়েছে। পাশ্চাত্য পোষাক তাদেরকে ভীষণভাবে বিমোহিত করেছে। আর পুরোটাই ঘটছে তারা ইসলাম সম্পর্কে না জানার জন্যে। কেন কুরআন তাদেরকে হিফাযতের নির্দেশ দিচ্ছে, কেন ইসলাম তাদেরকে আপাতঃদৃষ্টিতে তথাকথিত অবরোধে রুদ্ধ করেছে– সেই বাস্তব জ্ঞানটুকু অর্জনের চেষ্টাটা পর্যন্ত তাদের মধ্যে নেই। তারা এ কথা উপলব্ধি করার সুযোগই পাচ্ছে না যে, পাশ্চাত্যের নারীদের পোষাক পুরুষের লালসা-কামনাকে আরো বেশি উজ্জীবিত করে তোলার প্রতিযোগিতাতেই মত্ত। কিভাবে পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করা যায়, কিভাবে পুরুষদের সান্নিধ্যে আসা যায়, কিভাবে পুরুষেরা নারীদের উপর মাছির মতো আছড়ে পড়ে এটাই পাশ্চাত্যদের একমাত্র কাম্য। সেখানে নিষিদ্ধতা বলে কোন কিছু নেই। আর স্বাধীনতার নামে নারীরাও রীতিমত পুরুষের ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত হতেই যেন আনন্দবোধ করছে, করছে গর্ব ও অহংকারবোধ। এটাই যেন তাদের চূড়ান্ত প্রাপ্তি।

পশ্চিমা পুরুষেরাও ভোগবাদী জীবন ব্যবস্থাকে জীবনের চরম ও পরম মনে করে সব কিছুর মধ্যেই তারা নারীদেরকে এক্সপ্লয়েড করে সুবিধা হাসিল করছে। সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে নারীর যৌন আবেদনময়ী ছবি প্রদর্শন, সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রমণীদের দেহসৌষ্ঠব উপভোগকরণ, ফ্রি সেক্স-এর নামে নারীদেহকে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীতে পরিণতকরণ- এর সবই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহর ঠিক বিপরীত। ফলশ্রুতিতে কুরআন ও সুন্নাহ যেখানে নারীদের মানবতার সম্মান প্রদান করেছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সেখানে নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য সামগ্রীতে রূপান্তরিত করে নারী জাতিকে মানবেতর জীবন ব্যবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। আধুনিকতার নামে এই চাকচিক্যের পিছনে রয়েছে নিকশ কালো এক অন্ধকার। মূলতঃ যেখান থেকে নবী কারীম (ﷺ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন নারী তথা মানব জাতিকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এক সম্মানজক অবস্থানে।

কিন্তু সেই অপসংস্কৃতি ও কৃষ্টি মুসলিম রমণীদেরকে আজ আকৃষ্ট করায় নারীরা বেপর্দা জীবনকে বেছে নিচ্ছে স্বীয় আগ্রহে। অথচ আবূ দাঊদ ও তাবারানীতে বর্ণিত, “নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে, সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।” তাহলে কথা কি দাঁড়াল? মুসলিমদের হিজাব ছেড়ে আজ যদি মুসলিম রমণীরা বিজাতীয় সংস্কৃতি বা ইহুদি-নাসারাদের পথ অনুসরণ করে, তাহলে কি তারা কোনোভাবে মুসলিম বলে দাবি করতে পারেন? নবী কারীম (ﷺ)-এর এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণে সুস্পষ্টভাবেই বলা চলে যে, কোন মুসলিম মহিলারই এ অধিকার নেই যে, তারা ইহুদি-নাসারা রমণীদের পোশাক এবং সাজসজ্জাকে বরণ করে নিয়ে নিজদেরকে প্রকাশ করবে।

★ *গবেষণ ও গণমাধ্যম কর্মী।*

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মেনে না নেয়া : মুসলিম রমণীরা যদি আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য যথাযথভাবে মেনে নিত তাহলে হিজাব গ্রহণে তাদের কোনো আপত্তি থাকতো না। তারা রাসূলের নির্দেশনার চেয়ে উত্তম মনে করছে পাশ্চাত্য আভিজাত্যকে, উত্তম মনে করছে বিদেশী সভ্যতা ও অপসংস্কৃতিকে। সূরা মুহাম্মাদের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَن سَبِيْلِ اللهِ وَشَاقُّوْا الرَّسُوْلَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوْا اللهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾

"নিশ্চয় যারা কুফ্‌রী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে এবং তাদের নিকট হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতিই সাধন করতে পারবে না। আর শীঘ্রই তিনি তাদের 'আমলগুলোকে নিষ্ফল করে দেবেন।"[৭৬]

তারপরও আমাদের নারী সমাজ অবলীলাক্রমে আজ আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশনা অবমাননা করে ইহুদি নাসারাদের চাকচিক্যময় মরীচীকায় ঢাকা সভ্যতাকেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। সূরা আল আহ্‌যাব-এ বলা হয়েছে,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُه أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيْنًا﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে কোনো এখতিয়ার থাকে না, আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।"[৭৭]

অথচ নারীদের পর্দা গ্রহণের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের, স্বয়ং রাসূল (ﷺ)-এর। আর নির্দেশনা শতভাগ সুস্পষ্ট। সেই পর্দাকে পরিহার করে অশালীন পোশাকে বেপরোয়া জীবনকে বেছে নেয়া স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ-এর অবমাননা। আর নারীরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে বিদেশি চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ায় বেপর্দা হয়ে পড়ছে তাদের শরীর, বেপর্দা হয়ে পড়ছে তাদের তাক্বওয়া।

৩. শয়তানের প্ররোচনা : আল কুরআনের সূরা আল আ'রাফ-এ বর্ণিত রয়েছে,

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُوْرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ ۞ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾

"অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিলো যেন সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল... অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করলো। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করলেন, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়লো...।"[৭৮] এভাবে আদম ও হাওয়াকে প্ররোচিত করে আল্লাহর অবাধ্যতায় ফেলে শয়তান তাদের লজ্জাস্থানকে প্রকাশ করে দিয়েছিল। অহংকার করার কারণে শয়তানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জান্নাত থেকে বের করে লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন, তখন শয়তান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে অবকাশ চেয়ে ঘোষণা করে দেয়, "তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ (আদমের জন্য) সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের (আদম সন্তানদের) জন্য তোমার সোজা পথে বসে থাকবো। অতঃপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হবো, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে। আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞরূপে পাবে না।"

[৭৬] *সূরা মুহাম্মদ : ৩২।*
[৭৭] *সূরা আল আহ্‌যা-ব : ৩৬।*
[৭৮] *সূরা আল 'আরাফ : ২০-২২।*

শয়তান তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে মানব সমাজে যে সব অনাচার সৃষ্টি করে আসছে, বেপর্দা জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নারী জাতিকে সমাজের নিকৃষ্টতম পর্যায়ে উপনীত করে তাদের মানবতা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শয়তান স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, মানুষ নামক আদম সন্তানদেরকে পথচ্যুত করার অন্যতম সহজ মাধ্যম হচ্ছে নারী জাতি। নারীঘটিত অপকর্ম ও অনাচার সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসমাজকে অপবিত্র করার সবচেয়ে সুন্দর ও সহজ পথকে তাই সে লুফে নিয়েছে। নবী কারীম (ﷺ) তাই মানব জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন যা সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনান ইবনু মাজাহ্ ও সুনান আন্ নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে, "পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর ও কষ্টকর কোনো পরীক্ষা আমি রেখে যাচ্ছি না।"[৭৯]

সহীহ মুসলিমে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, "এই দুনিয়া হচ্ছে সুন্দর শ্যামল আবাসস্থল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, তোমরা কে কি কর্ম সম্পাদন করো, তিনি তা দেখবেন। অতএব, তোমরা পার্থিব জীবনের প্রলোভন থেকে এবং নারীঘটিত প্রলোভন থেকে নিজদেরকে রক্ষা করো যেমন, ইহুদিদের মধ্যে প্রথম অশান্তি ও অবক্ষয় নেমে এসেছিল নারীঘটিত কারণে।"[৮০]

অতএব, দেখা যাচ্ছে শয়তান নারীদেরকে এক্সপ্লয়েট করে অনাচারে লিপ্ত করার মাধ্যমে নারীদেরকে যেমন অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন করছে, তেমনি পুরুষদেরকেও করছে চরমভাবে বিপর্যস্ত। সূরা আল বাক্বারাহ্'র ২৫৭ নম্বর আয়াতে যেমন বলা হয়েছে–

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফ্‌রী করে, তাদের অবিভাবক হলো তাগুত (শয়তান)। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[৮১]

অর্থাৎ- যারা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাদের নির্দেশিত পথে চলছে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাদের অভিভাবকের দায়িত্ব নেবেন। আর যারা তাঁর এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করবে, যে সব নারী রাসূলের নির্দেশিত পথ বাদ দিয়ে শয়তানের পথকে বেছে নেবে তারা অবশ্যই কুফ্‌রী করল, তারাই জাহান্নামে নিপতিত হবে।

৪. ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা : আমাদের আজকের সমাজে নারীরা বেপর্দা জীবনকে বেছে নেয়ার আর এক অন্যতম কারণ হচ্ছে তারা ইসলাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। ইসলামী ধ্যান-ধারণা, ইসলামী চিন্তা-চেতনা, ইসলামী বিধান সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব নারীদেরকে ক্রমশঃ শয়তানের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কুরআন কী? কুরআন কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কুরআন কি বলছে, এর নির্দেশসমূহের উদ্দেশ্য কি এসব সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা মুসলিম নারী তথা পুরুষের জন্য অতি জরুরি। কিন্তু কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি পারিপার্শিক জীবনে আমরা নারীদেরকে এই জ্ঞান, এই শরিয়াহ, এই বিধান শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। এমনকি ইসলামে যে হিজাব বা পর্দা মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদাকর জীবনকেই সমুন্নত রাখছে, নারীর নারীত্বকে সম্মানিত করছে, নারীর জীবনকে সুরক্ষিত করে পবিত্রতার অবয়বে দাঁড় করাচ্ছে– এই সাধারণ জ্ঞান বা বিষয়টুকুকে পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছি। আর তাই স্বামীর সামনে স্ত্রী, পিতার সামনে কন্যা, ভ্রাতার সামনে ভগ্নি অবলীলাক্রমে পর্দাকে দূরে ফেলে দিয়ে ডাস্টবিনের আবর্জনা সমতুল্য মশা-মাছি আবিষ্ট চাকচিক্যময় বেহায়াপনা অশালীন জীবন ব্যবস্থা বেছে নিচ্ছে জীবনের ব্রত হিসেবে, যার দায়ভার গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকেও। ❑

[৭৯] *সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনান ইবনু মাজাহ্ ও সুনান আন্ নাসায়ী।*

[৮০] *সহীহ মুসলিম।*

[৮১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৫৭।*

কিশোর ভুবন

পরমবন্ধু তালগাছ এবং পরোপকারী খোরশেদ আলী

–মো. কায়ছার আলী*

“ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন যোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে ‘আসর,
মাগরিবের আজ শুনি আজান।
জামা‘আত শামিল হওরে ‘ইশাতে,
এখনো জামা‘আতে আছে স্থান।”

কী সুন্দর চমৎকার উপমা দিয়ে আমাদের প্রিয় জাতীয় কবি চিরকাল অলসতাকে ঠেলে দিয়ে এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি বলে চেতনা ও জাগরণের সম্ভাবনার জয়গান গেয়েছেন। বৃক্ষরোপণ (লালন পালনসহ) সবচেয়ে বড় সামাজিক বিপ্লব, মহৎকর্ম ও সাদকায়ে জারিয়াহ। বৃক্ষহীন স্থানই মরুভূমি, যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে গাছপালা নিধনে দাবদাহে পুড়ছে সোনারবাংলা। কাঠফাটা রোদ, ভ্যাপসা গরম এবং সীমাহীন লোডশেডিং এ পশুপাখি, উদ্ভিদ, প্রাণী সবারই হাঁসফাঁস অবস্থা। ভয়ংকরভাবে বিপর্যস্ত আমাদের জনজীবন। কালো মানুষের কালো থাবায় সাদামনের মানুষেরা কি বারবার হেরে যাবে? সাদামনের অধিকারীরা বা ভালো মানুষেরা কেবলমাত্র ভালো কাজ করে আত্মতৃপ্তি পান। বিনিময়ে কি পেলেন বা না পেলেন সেটার তোয়াক্কা করেন না।

সারাদেশে অনন্য রেকর্ড স্থাপনকারী ৭১ বছরের মুরুব্বি ইমাম ও পল্লী চিকিৎসক খোরশেদ আলীকে দেখতে গিয়েছিলাম ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চিলারং ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পাহাড়ভাংগা গ্রামে। তালগাছ প্রেমী বা পাগল এই মহান মানুষটি নিজের পৈতৃক পাঁচ বিঘা জমি বিক্রি করে অনেক দূরে গিয়ে তালের বীজ সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপজেলা, বিভিন্ন স্থানে সড়কে ইতিমধ্যে ৫২ হাজার ৩০০টি তালের বীজ স্বহস্তে গভীর রাতে নিদ্রাহীন থেকে সেগুলো রোপণ করে পরিচর্যা করছেন। কেন রাত ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত সেগুলো লাগান তা জানতে চাইলে তিনি বলেন “নানা বয়সী কিছু দুষ্টু প্রকৃতির মানুষ তালের আঁটিগুলো খেয়ে ফেলে এবং গাছগুলো উপরে দেয়।” তাঁর অদম্য ইচ্ছে হল এক লক্ষ তালের চারা রোপণ করে বিশ্বের বুকে এক সোনালী ইতিহাসের গৌরব অর্জন করা।

প্রকৃত পরিবেশ বন্ধু এই মহান লোকটিকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা, বুক ভরা উজাড় করা ভালোবাসা। তাঁর আবেগের মধ্যে মিশে আছে প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি গভীর মায়া, মমতা। বিশ্বকবির মতে “ন্যায়, নীতি ও সত্যতে অটল থাকার দৃশ্যমান বড্ড তালগাছ আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক।” কেননা তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, আবার সবগাছ ছাড়িয়ে, আকাশে উঁকি মারে। কবি রজনীকান্ত সেনের মতে ঝুলন্ত তালগাছে শক্ত বাসা বুননে বাবুই পাখি পরিশ্রমী, প্রকৌশলী ও আত্মমর্যাদার আরেক প্রতিচ্ছবি। শিশু মননের আলোড়িত ছড়া খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন-এর “ঐ দেখা যায় তালগাছ, ঐ আমাদের গাঁ...”।

দৃশ্যমান উঁচু তালগাছ যেন আবহমানকালের গ্রাম বাংলার পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়। তর্ক-বিতর্ক ও কথায় আমরা বলে থাকি “বিচার মানি কিন্তু তালগাছটি আমার”। যাকে সহজভাবে জোর করে জিতে যাওয়া বলে। বহুমাত্রিকভাবে তালগাছ আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান। বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বজ্রপাত) সারাবিশ্বে এক আতংকের নাম। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতামত হলো– তালগাছ, সুপারীগাছ এবং নারিকেল গাছ ঝড়, তুফান, টর্নেডো, প্রবল হাওয়া প্রতিরোধ, মাটির ক্ষয়রোধে সহায়তার পাশাপাশি আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করে।

এছাড়াও ভূমিধস, ভূমিক্ষয়, ভূ-গর্ভস্থ পানির মজুত বৃদ্ধি ও মাটির উর্বরতা রক্ষায় তালগাছের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তালগাছের আকর্ষণে বাড়ে মেঘের ঘনঘটা, ঘটে বৃষ্টিপাতও। তালগাছ রোপণে প্রথমেই তা মাটির নীচে প্রবেশ করে। এর ফলে গাছটি ঝড়ে হেলে পড়ে না কিংবা ভেংগে পড়ে না। সবচেয়ে আনন্দদায়ক খবরটি হল বজ্রপাত (বিদ্যুৎ স্পর্শ)-এর থাবা থেকে মানুষ, পশুপাখিসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এই গাছ আমাদের অকৃত্রিম ও পরীক্ষিত বন্ধু। তালগাছ ৯০-১০০ ফুট উঁচু হওয়ায় এবং বাঁকলে পুরু কার্বনের স্তর থাকায় আকাশের বিজলী গাছ হতে তা সরাসরি মাটিতে

*লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট। সদস্য, দিনাজপুর কলামিস্ট এসোসিয়েশন, দিনাজপুর।

চলে যায়। বেশি বেশি তালগাছ থাকলে গ্রামীণ জনপদের কৃষক, শ্রমিক, জেলে ও মেহনতি ইত্যাদি মানুষেরা মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

বজ্রপাত বাংলাদেশে জাতীয় দূর্যোগ হিসাবে পরিচিত। প্রতিবছর এই আকস্মিক মৃত্যু মৃত্যুর ঝুঁকি ও সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে। অনেক উপাকারী তালগাছের কান্ড, বাঁকল ও লতাপাতা। তালের কাঠ খুব শক্ত, মজবুত ও টেকসই। ঘরের খুঁটি আসবাবপত্র, বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী ও আদি যানবাহন নৌকা তৈরিতে তালকাঠ অনন্য। লোকজ চিকিৎসায় তালের ব্যবহার প্রচুর। মানব শরীরের কোষের ক্ষয়রোধ করে এবং তারুণ্য ধরে রাখে তাল। এককথায় পুরো তালগাছটিই হরেকরকম কাজে ব্যবহার হয়। কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় নয়। পরিপক্ব একটা তালগাছ দিয়ে কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।

পরোপকারী বৃক্ষ তালগাছ শাখা প্রশাখাহীন একবীজপত্রী উদ্ভিদ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় গাছেই ফুল হয়। ১২-১৩ বছর হলেই স্ত্রী গাছে ফল আসে। প্রচুর ভিটামিন ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ কাঁচা ও পাকা তাল সুস্বাদু ও মিষ্টি। একটানা ৯০-১২০ দিন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় ১২-১৫ কেজি রস দেয়। পাঁচ কেজি রস থেকে এককেজি গুড় তৈরি হয়। তালগাছ ১৪০-১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। ভালো কাজে পুরস্কার ও মন্দ কাজে তিরস্কার সবারই করা উচিত।

আজ দেশের আনাচে কানাচে কিছু মহৎপ্রাণ ব্যাক্তি, সংগঠন স্ব-উদ্যোগে যেভাবে তালগাছ বা অন্যগাছ লাগাচ্ছেন সে কাজগুলোকে সরকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করা উচিত। ছোট্ট আয়তনের এই দেশে সুষ্ঠু মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামীণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে তালগাছ লাগিয়ে বজ্রপাতে প্রাণহানি কমানো সম্ভব।

বিদ্যুৎস্পর্শ থেকে জীবন রক্ষায় উঁচু তালগাছের বিকল্প নেই। প্রতিটি সমস্যার সমাধান যুক্তিসঙ্গতভাবে বা মাঝে মাঝে অলৌকিকভাবে হয়ে থাকে। সরকারের আর্থিক প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যে কোনো সফলতা দ্রুত করা অসম্ভব নয়। তালগাছের সারিসারি নান্দনিক সৌন্দর্যরূপ দেখতে যেমন সুন্দর ঠিক তেমনি রয়েছে এর বিভিন্নরকম উপকারীতা। অকালমৃত্যু থেকে দেশবাসী তালগাছের ছোঁয়ায় শুধু রক্ষাই পাবে না, সবুজ বেষ্টনীতে গড়ে উঠবে আমাদের গ্রাম বাংলার প্রতিটি গ্রামের কৃষি, অকৃষি ভূমি। একজন পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার মতো সবাই এই অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে চায়। ❑

হিজরি সনের ইতিহাস

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

মুসলিম ঐতিহ্যের অনুকরণ : হিজরি সন গণনা ইসলামী সংস্কৃতির অনুসরণ। এজন্য চন্দ্র মাস হিসাবে হিজরি সন গণনা করা মুসলমানদের জন্য কর্তব্য। হিজরি সন ইসলামী ঐতিহ্যের বাস্তব নমুনা। যা নিজ ঐতিহ্যকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে শেখায়।

মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে যে সব উপাদান উজ্জীবিত করেছে তন্মধ্যে হিজরি সন অন্যতম। বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর কৃষ্টি কালচারে হিজরি সন ও তারিখের গুরুত্ব অপরিহার্য। হিজরি সন গণনার সূচনা হয়েছিল ঐতিহাসিক এক অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তদীয় সাথীবর্গের মক্কা থেকে মদীনা হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আরবী মুহার্‌রম মাসকে হিজরি সনের প্রথম মাস ধরে সাল গণনা শুরু হয়েছিল। দ্বীনের স্বার্থে মক্কা থেকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কিরামের হিজরত থেকেই হিজরি সনের সূচনা। মুসলমানগণ হিজরি সনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি-বিধান যথা- রমাযানের রোযা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং বিভিন্ন মাসের নফল রোযা ইত্যাদি পালন করে থাকেন।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক দিন বা ঘটনাভিত্তিক বহু সনই বিশ্বে প্রচলিত হয়ে আসছে। উদাহরণতঃ খ্রিষ্টীয় স্মারক সন খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত। জাতিগতভাবে কোনো জাতির পক্ষেই আপন ঐতিহ্য ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে মুসলিম পরিবারগুলোও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত অন্যান্য সন তারিখ অনুসরণ করা সত্ত্বেও সূচনালগ্ন থেকেই হিজরি সনকে পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরি সনের অনুসারী। খ্রিষ্টীয় সন, বাংলা সনসহ অন্যান্য সনের প্রচলন সত্ত্বেও আরবী সনের দিন মাসের হিসাব চর্চা এতটুকুও ম্লান হয়নি। হিজরি সন মুসলিম উম্মাহকে মনে করিয়ে দেয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কা থেকে সুদূর মদীনায় হিজরতের ঘটনাকে। বস্তুত তাঁর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সেই ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মৃতিবাহী হচ্ছে হিজরি সন। এই হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী ঘটনা। হিজরতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাক্কী জীবনের অবসান ঘটে এবং মাদানী জীবনের সূচনা হয়। হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামের সুদীর্ঘ বিজয়ের পথ সুপ্রশস্ত হয়। ❑

কবিতা

জান্নাতি সুখ

মোল্লা মাজেদ★

তোমার আলোয় দাও ভরে দাও প্রাণ নিত্য দোলাও
তোমার হাওয়ায় চিত্ত ধীর পবনে ছড়াও খোশবু ঘ্রাণ
দাও ভেঙে দাও রক্তলোলুপ বৃত্ত শান্ত ভাষায় দীপ্ত
আশায় তোমার কাছেই চাওয়া।
প্রশান্তি চাই নিথর নিখিল মাঝে দোলাও বিশ্ব সত্য
ন্যায়ের কাজে আর চাহিনা রক্ত লেলিহান চলুক বিশ্বে
তোমারি ফরমান হাল জীবনে সংগোপনে এটাই পরম
পাওয়া।
দূর করে দাও ভয় ভীতি আর জীর্ণ জরা লাজ নিষ্ঠা
মনে করতে পারি তোমার দেওয়া কাজ, হয় যেন এই
কণ্ঠে আমার তোমারি গান গাওয়া তবেই হবে বিশ্ব
ভবে জান্নাতি সুখ পাওয়া।

ভেজাল

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

আদায় ভেজাল ধাঁধায় ভেজাল
ভেজাল এখন অয়েলে
চালে ভেজাল ডালে ভেজাল
ভেজাল মশার কয়েলে!
একটার পর একটা জ্বালাই
আছে যত দামি
গাইছে মশা কানের পাশে
হয় না কোনো কামই!
ফুলে ভেজাল কুলে ভেজাল
ভেজাল ডাবের পানিতে
কেশেও ভেজাল দেশেও ভেজাল
ভেজাল রাজা-রাণিতে!
জনে ভেজাল মনে ভেজাল
ভেজাল ভালোবাসাতে
ভাঙতে ভেজাল গড়তে ভেজাল
ভেজাল স্বপ্ন আশাতে!
আঁখি মেলে যেদিকে চাই
শুধু ভেজাল দেখি
দেখতে আসল মনে হলেও
আসলে সব মেকী!

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক

রোকেয়া রহিম

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড
আমরা সবাই জানি,
পিতা-মাতার পরেই শিক্ষক
সকলেই তা মানি।
নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা,
বিনয়, শিষ্টাচার-
স্যারের থেকেই পেয়েছি সবাই
জ্ঞানের এ ভাণ্ডার।
বিকাশ সাধনে গঠন করেন
আমাদের শরীর-মন,
মানুষে মানুষে নাইকো তফাত
সকলেই আপনজন।
শ্রদ্ধা, স্নেহ, আদর শিখেছি
যাঁর অকুতো আহ্বানে,
মানব জাতির দায়িত্ব পেয়েছি
তাঁর অমোঘ অবদানে।
সবার হৃদয়ে জ্বালিয়ে আলো
আঁধার করেন দূর,
একই মননে এগিয়ে যাবো
বাজবে সুখের সুর।
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে যিনি
করেন জ্ঞান দান-
জাতি গঠনে সবার কল্যাণে
তিনিই দেশের মান।
শিক্ষক হলেন শ্রদ্ধেয় গুরুজন
মানুষ গড়ার কারিগর,
চিরদিন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবো
জ্ঞানের আলোয় জীবনভর।

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

স্বাস্থ্য সচেতনতা

রাসেলস ভাইপার আতঙ্ক যা বলল বন বিভাগ

দেশের বেশ কিছু জেলায় রাসেলস ভাইপার সাপ নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ফেসবুকে বিষয়টি নিয়ে অনেকে নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। অনেকে প্রচার করছেন যে, সাপটি কামড় দিলে দ্রুত মানুষের মৃত্যু হয়।

পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, রাসেলস ভাইপার সাপ মেরে ফেলার প্রচারণাও চালানো হচ্ছে ফেসবুকে। এমন অবস্থায় ফরিদপুরের একজন রাজনীতিবিদ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, রাসেলস ভাইপার সাপ মারতে পারলে প্রতিটির জন্য ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ সাপের আক্রমণে আতঙ্কে দিন পার করছেন জনসাধারণ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে শুক্রবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিস্তারিত তুলে ধরেছে বাংলাদেশ বনবিভাগ।

বনবিভাগ বলেছে, ওই গত ১০ বছর আগেও এই চন্দ্রবোড়া বা রাসেলস ভাইপার তেমন চোখে পড়ত না। মূলত ২০১২ সালের পর থেকে এই সাপের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। রাসেলস ভাইপার দক্ষ সাঁতারু হওয়ায় নদীর স্রোতে ও বন্যার পানিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে।

রাসেল'স ভাইপার স্বভাবগতই কিছুটা তেজী। এটি মেটে রঙের হওয়ায় মাটির সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে। মানুষ খেয়াল না করে সাপের খুব কাছে চলে যায়, ফলে সাপটি বিপদ দেখে ভয়ে আক্রমণ করে। এই সাপটির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পেছনে মূলত মানুষ হিসেবে আমরাই দায়ী। যেসব প্রাণী রাসেলস ভাইপার খেয়ে এদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে, প্রকৃতিতে এদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। কিছু সাপ যেমন- শঙ্খচূড়, খইয়া গোখরা, কালাচ বা কেউটে, শঙ্খিনী রাসেলস ভাইপারসহ অন্যান্য সাপ খেয়ে থাকে। বেজি, গুইসাপ, বাগডাশ, গন্ধগোকুল, বন বিড়াল, মেছো বিড়াল এরাও রাসেল'স ভাইপার খেয়ে থাকে।

এছাড়া তিলা নাগ ঈগল, সারস, মদন টাক এই সাপ খেতে পারে। বন্যপ্রাণী দেখলেই তা নিধন করার প্রবণতা, কারণে অকারণে বন্যপ্রাণী হত্যা, এদের আবাসস্থল ধ্বংস করাসহ বিভিন্ন কারণে দেশের সর্বত্রই এসব শিকারি প্রাণী আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ফলে রাসেলস ভাইপার অত্যধিকহারে প্রকৃতিতে বেড়ে গেছে।

রাসেলস ভাইপার নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে :

১. যথাসম্ভব সাপ এড়িয়ে চলুন, সাপ দেখলে তা ধরা বা মারার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নিন বা নিকটতম বন বিভাগ অফিসে খবর দিন।

২. যেসব এলাকায় রাসেলস ভাইপার দেখা গিয়েছে, সেসব এলাকায় চলাচলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন।

৩. রাতে চলাচলের সময় অবশ্যই টর্চ লাইট ব্যবহার করুন।

৪. সাপে কাটলে ওঝার কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। রোগীকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। দংশিত স্থানের উপরে হালকা করে বেঁধে দিন।

৫. রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যান।

৬. আতঙ্কিত হবেন না, রাসেলস ভাইপারের অ্যান্টি ভেনম নিকটস্থ হাসপাতালেই পাওয়া যায়।

[সূত্র : যুগান্তর অনলাইন]

বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব, জনমনে আতঙ্ক ও আমাদের করণীয় : সাপের কথা শুনলেই অজানা আতঙ্কে মানুষের গা শিউরে উঠে। আবার অনেকে সাপ দেখামাত্র মেরে ফেলতে উদ্যত হন। সাপ মেরে নিজের ক্ষমতা আর শক্তিমত্তা জাহির করতে চান। সাপ নিয়ে অজ্ঞতা, সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ও কুসংস্কারে বিশ্বাস এর মূল কারণ।

সর্পবিদ ও গবেষকদের মতে, সাপ খুব ভীতু প্রকৃতির সরীসৃপ। বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বাড়ে। বাংলাদেশে প্রায় ১০৩ প্রজাতির সাপের দেখা মেলে, তার মধ্যে ২৮ প্রজাতি বিষধর। অন্য প্রজাতিগুলো নির্বিষ। বিষধর ২৮ প্রজাতির সাপের মধ্যে ১৩ প্রজাতি সামুদ্রিক, বাকি ১৫ প্রজাতির সবগুলোর দেখা মেলে না। আমাদের দেশে বিষধর সাপের মধ্যে চন্দ্রবোড়া, পদ্ম গোখরা, গোখরা, কালাচ, সিন্ধুকালাচ, কালকেউটে, লালগলা ঢোড়াসাপ, সবুজ বোড়া, শঙ্খচূড়, শঙ্খিনী প্রজাতির দেখা মেলে।

কামড়ানোর প্রবণতা : অধিকাংশ সাপই নিরীহ শান্ত-স্বভাবের। সহজে কাউকে কামড়ায় না। সাপ মানুষের

পায়ের নীচে চাপা পড়লে, বিপদের আভাস পেলে বা কেউ বিরক্ত করলে, ভয় পেলে, অথবা কারও শরীরের সংস্পর্শে এলে আত্মরক্ষার্থে কামড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রেও বিষহীন কামড়ের সংখ্যাই বেশি। কারণ বিষ সাপের কাছে মূল্যবান অস্ত্র।

কামড়ের ধরন : বিষধর সাপ যেখানে কামড় দেবে, সেখানে একাধিক বা একটি দাঁতের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাবে। আর যদি অনেকগুলো সারিবদ্ধ দাঁতের ক্ষত দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে সেটা নির্বিষ সাপের কামড়।

বিষধর সাপের কামড়ে যেসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে : চোখ বুজে আসবে, ঘুম ঘুম লাগবে বা চোখ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। ঘাড় একদিকে হেলে পড়বে, ঘাড় ভেঙে বাঁকা হয়ে যাবে, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যাবে, অস্পষ্টভাবে কথা বলবে। এ ধরনের ব্যক্তি সোজা হয়ে বসতে বা মানুষকে চিনতে পারবে না, শুয়ে পড়তে চাইবে। দংশনের জায়গা ফুলে উঠতে পারে, ফোস্কা পড়তে পারে বা ঘা হতে পারে। রক্তের কণিকা ভেঙে যাওয়ায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। রক্ত নালী ছিঁড়ে যেতে পারে, টিস্যু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফোস্কা ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে পারে। পেটে তীব্র ব্যথা, কিডনি আক্রান্ত হতে পারে। শরীরের ভেতরের অঙ্গ আক্রান্ত হয়ে রক্ত বমি, রক্ত পায়খানা হতে পারে, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বের হতে পারে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা সম্পর্কিত সাধারণ ভুল : সাপ দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ওঝা বা কবিরাজের কাছে যাওয়া। দংশনের জায়গা ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়া। মুখ দিয়ে চুষে রক্ত বের করে দেওয়া ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার বাদ্য বাজনা বাজানো, দলবদ্ধভাবে গান গাওয়া, ধূমপান করা ও দংশিত ব্যক্তিকে কাত-চিত করা।

চিকিৎসা : রোগীকে মানসিক সাহস দেওয়া, বিষধর সাপ দংশন করেছে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই সময় নষ্ট না করে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেনারেল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেখানে অ্যান্টিভেনম পাওয়া যাবে, সেখানেই নিয়ে যাওয়া। দংশনের জায়গায় কোনো ধরনের এসিড বা মরিচের গুঁড়ো দেওয়া যাবে না। কোনো প্রকার তাবিজ, তেল, বড়ি জাতীয় কিছু লাগাবেন না। যানবাহনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মোটরসাইকেল ব্যবহার করা যাতে সময়ক্ষেপণ না হয়। হাত-পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া না করা, দংশিত ব্যক্তিকে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা। বিষাক্ত সাপে ছোবল মারার দুই ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরি। সাপে কাটলে তাৎক্ষণিকভাবে আংটি, চুরি, ব্রেসলেট, ঘড়ি খুলে ফেলুন। ঘাবড়াবেন না, বেশি ঘাবড়ালে মনোবল ভেঙে যাবে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার সহায়তা কামনা করুন, যিনি আপনাকে মুহূর্তের মধ্যেই পরিত্রাণ দিতে পারেন।

সাপের দংশন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় এবং সর্তকতা : বাড়ির চারপাশে ঝোপ-জঙ্গল, আর্বজনা থাকলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। ইঁদুরের গর্ত থাকলে সেগুলো ভরাট করে দেওয়া। রাতে বাইরে বের হলে টর্চ লাইট ব্যবহার করা। বিস্তীর্ণ মাঠে কৃষি ফসল উৎপাদন বা গৃহপালিত পশু চরানোর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গামবুট বা প্রয়োজনবোধে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করা। বাড়ির আঙিনায় গর্ত, ইটের স্তূপ, কাঠের স্তূপ, খড়ের পালা, আর্বজনার স্তূপ, পাথরের ফাঁক, বুট বা জুতায় হাত দেওয়া বা পায়ে পরার আগে ভালো করে দেখে নেওয়া। অন্ধকারে পথ চলার সময় লাঠি দিয়ে ঠুকঠুক শব্দ করে পথ চলা। কখনো সাপ সামনে পড়ে গেলে, ভয় না পেয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা নীরবে সর্তকতার সঙ্গে বিকল্প পথ ব্যবহার করা। মৃত বা জীবিত, বিষাক্ত বা নির্বিষ যে সাপই হোক না কেন নিজেকে জাহির করা বা বীরত্ব প্রকাশের জন্য ধরার চেষ্টা না করা। কারণ জীবিত সাপ মরার ভান করে শুয়ে থাকতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে বিছানার আশপাশে ভালো করে দেখে নেওয়া বা চাদর, বালিশ, লেপ, কাঁথা ভালো করে ঝেড়ে মশারি টাঙিয়ে ঘুমাতে যাওয়া। রাতের বেলা বিছানা থেকে নামার আগে আলো জ্বালিয়ে ভালোভাবে দেখে নেওয়া। বাড়ির আঙিনায় সাপের উপদ্রব দেখা দিলে চারপাশ পরিষ্কার করে সপ্তাহে ১ (এক) বার পরিমিত আকারে ব্লিচিং পাউডার ছিটানোর ব্যবস্থা করা। বাড়িতে খড়ের গাদা, লাকড়ির স্তূপ থেকে খড় বা লাকড়ি সংগ্রহের আগে লাঠি দিয়ে শব্দ করুন।

একমাত্র সতর্কভাবে চলাফেরাই মানুষকে সাপের দংশন থেকে সুরক্ষা দিতে পারে। আমাদের দায়িত্বশীল আচরণে প্রকৃতিতে মুক্তভাবে বাঁচবে সাপ। ❑

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ইসলামী শরীয়তে বিবাহ করার হুকুম কি?

রায়হান আহমেদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

জবাব : ইসলামী শরীয়ত যুবকদেরকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং ধার্মিক পুরুষদেরকে নেককার মহিলা বিবাহ করার আদেশ দিয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

«اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ».

"বিবাহ করা আমার সুন্নাত। অতএব যে ব্যক্তি বিবাহ করবে না, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"– ***(সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৪৯৬)***। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব সৎকর্মশীল স্ত্রী ও সৎ সন্তান চাওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর কাছে নেককার স্ত্রী ও সৎ সন্তান চাওয়া নবী-রাসূল ও ওলী-আওলীয়াদের সুন্নাত। যারা মহান আল্লাহর কাছে সৎ সন্তান ও সৎ স্ত্রী চায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾

"আর যারা বলে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী-সন্তান দান করো, যা আমাদের চক্ষু শীতলকারী হবে"– ***(সূরা আল ফুরক্বা-ন : ৭৪)***। সাধারণ মানুষের কাছে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, বিবাহ করা ফরয। আসলে সঠিক কথা হচ্ছে, ব্যক্তি অনুসারে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কেউ যদি বিবাহ না করলে চরিত্র ধ্বংসের আশঙ্কা করে এবং অশ্লীল কাজে জড়িত হয়ে যাওয়ার ভয় করে, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা জরুরি। তবে শর্ত হচ্ছে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়ার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। আর তা না থাকলে সিয়াম রেখে যৌন উত্তেজনা ধমন করে রাখতে হবে। যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়ার ক্ষমতা দান করেন। আর যারা বিবাহ না করলে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে না, তাদের জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। আর যাদের শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য নেই, তাদের জন্য বিবাহ করা ঠিক নয়। মহান আল্লাহই অধিক জানেন।

জিজ্ঞাসা (০২) : নেককার ও সালাফী মানহাজ এমন দ্বীনদার মেয়ে পাওয়ার জন্য কোনো 'আমল আছে কি?

জিমি আব্দুল্লাহ
সেক্টর- ১২, রোড- ২এ, উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : পার্থিব জীবনে সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য একজন পুরুষের সৎ ও নেককার স্ত্রীর প্রয়োজন। হাদীসে সৎ ও নেককার স্ত্রীকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ভোগের বিষয় বলা হয়েছে। অতএব প্রত্যেক ধার্মিকেরই উচিত দ্বীনদার স্ত্রী পাওয়ার চেষ্টা করা। সৎ ও ধার্মিক স্ত্রী পাওয়ার জন্য আমরা আপনাকে নিম্নের পরামর্শগুলো দিচ্ছি। এগুলো অনুসরণ করলে, আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সৎকর্মশীল ও সালাফী মানহাজের স্ত্রী উপহার দিয়ে ধন্য করবেন।

১) আপনি এ ব্যাপারে সবসময় মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" ***(সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব : ৩)***

২) বিবাহ'র মাধ্যমে আপনি নিজের চরিত্র সংরক্ষণ করার নিয়ত করবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ : ... فذكر منهم : النَّاكِحَ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ.

"আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এমন পুরুষ, পবিত্র থাকার জন্য বিবাহ করে।" ***(গায়াতুল মুরাম- হা. ২১০)***

৩) ধার্মিক স্ত্রী অনুসন্ধান করা। নবী (ﷺ) বিবাহ করার সময় দ্বীনদার মহিলাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। নবী (ﷺ) বলেন,

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ".

"চার কারণে মহিলাকে বিবাহ করা হয়ে থাকে। তার সম্পদের কারণে, বংশীয় মর্যদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দ্বীনের কারণে। আর তুমি দ্বীনদারকে প্রাধান্য দাও। তাহলে তোমার হস্তদয় বরকতময় হবে। *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৬৬)*

৪) পাত্রী বাছাই করার পর বিবাহ করার পূর্বে বিশ্বস্ত ও দ্বীনদার লোকের সাথে পরামর্শ করা।

৫) পাত্রী বাছাই করার পর বিবাহ করার পূর্বে ইস্তেখারা করা। নবী (ﷺ) প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে ইস্তেখারার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। তাই বিবাহ করার পূর্বে ইস্তেখারা করা সুন্নাত।

৬) সৎ ও ধার্মিক লোকদের কাছে নেককার ও সালাফী মানহাজের পাত্রীর সন্ধান চাওয়া। প্রিয় দ্বীনি ভাই! আপনি যদি দৃঢ়তার সাথে ও ধীরস্থিরভাবে উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে আশা করা যায় আপনি দ্বীনদার সালাফী পাত্রী পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাওফীক দিন।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***হাদীসে বিভিন্ন রকমের দু'আ আছে, সেগুলো নামাযের শেষ বৈঠকে ও সিজদায় পড়া যাবে কি?***

মো. ফয়সাল মাহবুব
চট্টগ্রাম।

জবাব : সহীহ হাদীসে যেসব দু'আ এসেছে, সেগুলো সিজদায় ও শেষ বৈঠকে পড়া যাবে। এমনকি কুরআনুল কারীমে নাযিলকৃত দু'আগুলোও দু'আর নিয়তে পড়লে কোনে অসুবিধা নেই। যেমন- কেউ যদি এভাবে পড়ে–

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

কারণ তখন দু'আ করা উদ্দেশ্য হবে, তিলাওয়াত উদ্দেশ্য হবে না। রাসূল (ﷺ) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"সমস্ত 'আমল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর প্রত্যেক লোকের জন্য তাই রয়েছে, যার নিয়ত সে করে"– *(দেখুন : সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৭)*। অতএব কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত সুন্দর সুন্দর দু'আগুলো সিজদায় ও সালাতের শেষাংশে পাঠ করা যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***হানাফী মাযহাবের লোকেরা বলে থাকে, ওলী-আওলীয়া ও সৎ লোকদের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করা যাবে। আসলে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ)'র 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে জানতে চাই।***

মুহাম্মদ কামরুল হাসান গাজী
গাংনী, মেহেরপুর।

জবাব : শরীয়তসম্মত ওয়াসীলা এবং বিদআতী ওয়াসীলা সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) 'আক্বীদাহ্ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ওয়াসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা কারো জন্য বৈধ নয়। নিম্নের আয়াতে মহান আল্লাহর নামের ওয়াসীলা দিয়ে দু'আ করার অনুমতি এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।" *(সূরা আল আ'রাফ : ১৮০; রাদ্দুল মুখতারের টিকাসহ আদ্দুর রুল মুখতার- ৬/৩৯৬-৩৯৭)*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) আরো বলেন, দু'আকারীর জন্য এ কথা বলা মাকরূহ যে, হে আল্লাহ! আমি অমুকের ওয়াসীলায় কিংবা আপনার নবী-রাসূলগণের ওয়াসীলায় এবং কাবা ঘরের ওয়াসীলায় অথবা পবিত্র স্থানের ওয়াসীলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) আরো বলেন, মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ওয়াসীলা দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা বৈধ নয়। তিনি বলেন, কারো এভাবে বলা যে, তোমার আরশের সম্মানের ওয়াসীলায় অথবা তোমার সৃষ্টির হক্বের ওয়াসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি –এমন কথা বলা আমি অপছন্দ করি। *(শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্ তাহাবীয়া- পৃ. ২৩৪; শারহুল ফিক্বহুল আকবার- পৃ. ১৯৮)*

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রাহিমাহুল্লা-হ) সাহেবের 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে জানতে চাই। 'আক্বীদাহ্ বিষয়ে তার কোনো লেখনী থাকলে দয়া করে জানাবেন।***

মঈন খান
সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।

জবাব : নবাব মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রাহিমাহুল্লা-হ) ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাকে আহলুল হাদীস আলেমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কারণ, তিনি প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের কোনোটিরই মুকাল্লিদ

ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই দিয়েছিলেন। তার যেমন ছিল ধর্মীয় 'ইল্ম তেমনই ছিল বৈষয়িক সম্পদ। তিনি তার ধন-সম্পদ দ্বীনের জন্য খরচ করেছেন। ফিকহ বিষয়ে তার লেখনি রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আর-রাওযাতুন নাদীয়া শারহুদ দুরার আল-বাহীয়া নামক কিতবটি 'ইল্মুল ফিকহে তার পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তবে 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কে তার নির্দিষ্ট কোনো কিতাব আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু তার বিভিন্ন উক্তিতে সালাফদের 'আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন, মহান আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব সালাফদেরই মাযহাব। সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনা করা ছাড়াই আমরা মহান আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করি এবং তাঁর সিফাতগুলো অকার্যকর করা ছাড়াই সৃষ্টির সাথে তাঁর সাদৃশ্য করা থেকে পবিত্র রাখি। এটি ইসলামের ইমামগণ যেমন- মালিক, শাফে'য়ী, সুফ্ইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব। দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো বিবাধ নেই। অনুরূপভাবে আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র ব্যাপারেও একই কথা। তার থেকে প্রমাণিত 'আক্বীদাহ্ এসব ইমামের 'আক্বীদার মতোই। তা হলো– কুরআন ও সুন্নাহয় উল্লেখিত 'আক্বীদাহ্। ***(দেখুন : চার ইমামের 'আক্বীদাহ্- পৃ. ৩)***

জিজ্ঞাসা (০৬) : শুনেছি শিয়ারা তাদের ইমামদের কবর যিয়ারত করাকে ইসলামের ৫ম রুকন কা'বাঘরের হজ্জ পালন করার চেয়ে উত্তম মনে করে। কথাটি কি সঠিক?

নিঝুম খান

সুত্রাপুর, ঢাকা।

জবাব : শিয়াদের শাইখদের মতে, তাদের ইমামদের মাযার ও কবর যিয়ারত করা কা'বাঘরের হজ্জ করার চেয়ে উত্তম। তারা বর্ণনা করে থাকে যে, ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ'র কবর যিয়ারত করা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে আদায়কৃত ত্রিশটি পবিত্র ও মাকবুল হজ্জের সমতুল্য। ***(সাওয়াবুল আ'মাল- পৃ. ৫২)***

তারা আরো বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইনের মাযার যিয়ারত করবে, তার 'আমলনামায় রাসূল (ﷺ)-এর সাথে আদায়কৃত ৭০টি হজ্জের সাওয়াব লিখা হবে। তারা আরো বর্ণনা করে থাকেন যে, যে ব্যক্তি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মাযার যিয়ারত করবে, তার 'আমলনামায় ইমাম কায়েমের সাথে আদায়কৃত ১০ লাখ হজ্জের সাওয়াব লিখা এবং রাসূল (ﷺ)-এর সাথে আদায়কৃত ১০ লাখ 'উমরার সাওয়াব লিখা হবে– ***(তাহযীবুল আহকাম- ৬/৪৯)***। তারা ইমাম রেযা থেকে বর্ণনা করে থাকে যে, যে ব্যক্তি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কবর যিয়ারত করলো, সে আরশের উপরে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলো– ***(বিহারুল আনোয়ার- ৯৮/৬৯)***। শিয়াদের এ ধরণের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন এখনো শেষ হয়নি। এভাবে যুগে যুগে তারা মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা করেই চলছে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : দুই সাজদার মধ্যবর্তী দু'আটা কি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

মো. মোকসেদুল ইসলাম
লালমনিরহাট, রংপুর।

জবাব : সুনান আন্ নাসায়ী ও সুনান ইবনু মাজায় হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) দুই সিজদার মাঝখানে «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ» রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী বলতেন– ***(দেখুন : মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ৯০১)***। আর সুনান আবূ দাঊদে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) দুই সিজদার মাঝখানে «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ» পাঠ করতেন– ***(দেখুন : মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহ্ক্বীক্ব : আলবানী, হা. ৯০০)***। অতএব মুসল্লী উপরের দু'টি দু'আর যে কোনো একটি দুই সিজদার মাঝখানে পাঠ করতে পারে। অথবা দু'টি দু'আ-ই পাঠ করতে পারে। দু'আ দু'টি একবার কিংবা একাধিকবারও পাঠ করতে পারে। এতে স্পষ্ট হয় যে, উপর্যুক্ত দু'আ দু'টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত।

জিজ্ঞাসা (০৮) : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ কি গায়েব জানে?

হেলাল উদ্দিন
যশোর।

জবাব : শিয়া ও সুফীদের শাইখগণ দাবি করেন যে, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, আমি ১২বার আমার রবের নিকট গমণ করেছি। প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে তার মারেফত দান করেছেন এবং আমাকে গায়েবের চাবিকাঠি প্রদান করেছেন– ***(তাফসিরুর ফুরাত- পৃ. ৬৭)***। তারা আরো দাবি করে যে, তাদের ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি আসমান-যমীনের সবকিছু জানি। জান্নাতের মধ্যে যা কিছু আছে, তা জানি এবং যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা জানি এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে, তাও জানি– ***(বিহারুল আনোয়ার- ২৬/১১১)***। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জল ভাগের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"– *(সূরা আল আন'আম : ৫৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾

"হে নবী! তুমি বলে দাও, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না"– *(সূরা আন্ নাম্‌ল : ৬৫)*। অতএব এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণীত যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।

জিজ্ঞাসা (০৯) : সাহু সাজদাহ্ কী, কখন দিতে হবে ও সাহু সাজদাহ্ দেয়ার নিয়ম কী কী?

এইচ. খান, চট্টগ্রাম।

জবাব : নামাযে ভুল হলে যেই সিজদাহ্ দিতে হয়, তাকেই সাহু সিজদাহ্ বলা হয়। এই সিজদাহ্ মূলত দু'টি। একাধিকা সালাতে সাহু সিজদাহ্ আবশ্যক হয়। ১) নামায বৃদ্ধি হওয়া। ২) কম হওয়া। ৩) নামাযে সন্দেহ হওয়া।

সালাতে বৃদ্ধি হওয়া : যেমন কেউ একটি রুকূ' বাড়িয়ে ফেলল কিংবা একটি সিজদা কমিয়ে ফেলল কিংবা বৈঠক কিংবা কিয়াম বাড়িয়ে ফেলল।

কম হওয়া : যেমন কেউ নামাযের একটি রুকন বাড়িয়ে ফেলল কিংবা নামাযের কোনো ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দিল।

সন্দেহ করা : উদাহরণস্বরূপ যেমন কেউ নামাযে সন্দেহ করলো। কত রাকআত পড়েছে তিন রাকআত না কি চার রাকআত এনিয়ে সন্দেহে পড়ে গেল। সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ করলো।

কেউ যদি ইচ্ছা করে নামাযে একটি রুকূ', কিংবা একটি সিজদাহ অথবা একটি বৈঠক কিংবা একটি কিয়াম বৃদ্ধি করে, তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে এমন নিয়মে নামায পড়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের বিপরীত। নবী (ﷺ) বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

"যে ব্যক্তি আমাদের আদেশের বিপরীত 'আমল করবে তার 'আমল প্রত্যাখ্যাত হবে।" *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : আকযিয়া, অনুচ্ছেদ : বিচার-ফায়সালা, হা. ১৮/১৭১৮)*

কিন্তু ভুলবশত তা করলে নামায বাতিল হবে না। তবে সে ভুলের কারণে সালামের পর সাহু সাজদাহ্ দিবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ মর্মে দলিল রয়েছে। একদা সন্ধ্যাকালীন কোনো নামাযে রাসূল (ﷺ) অর্থাৎ- যোহর কিংবা আসর নামাযে চার রাকআতের স্থলে দুই রাকআত পড়েই সালাম ফিরিয়ে দিলেন। সাহাবীগণ যখন তাকে এ মর্মে স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনি বাকী নামায পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। অতঃপর সালামের পর দু'টি সাহু সাজদাহ্ দিলেন। *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নামায, অনুচ্ছেদ : মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে থাকা অবস্থায় হাতের আঙ্গুল দিয়ে জাল বানানো; সহীহ মুসলিম)*

অনুরূপ 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে,

صَلَّى النَّبِيُّ (ﷺ) : الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالُوْا : أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : «وَمَا ذَاكَ» قَالُوْا : صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

নবী করীম (ﷺ) একদা সাহাবীদেরকে নিয়ে যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়ে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি উভয় পা বিছিয়ে বসলেন, কিবলামুখী হলেন এবং দু'টি সাজদাহ্ দিলেন। *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নামায, অনুচ্ছেদ : নামাযে কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, হা. ৪০৪; সহীহ মুসলিম)*

জিজ্ঞাসা (১০) : কারবালাতে হুসাইনের মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়া কি জায়িয?

তুষার খান
হোসেনি দানাল রোড, ঢাকা।

জবাব : ইমাম ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দৌহিত্র সায়্যেদ হুসাইন ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির অন্যতম নেতা। রাসূল (ﷺ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পুত্র হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে 'ইবাদত গোজার, দানবীর এবং অত্যন্ত সাহসী বীর। হাসান ও হুসাইনের ফযীলতে রাসূল (ﷺ) থেকে একাধিক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে

ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম আলামত এবং নবী পরিবারের কোন সদস্যকে ঘৃণা করা ও গালি দেয়া মুনাফেকির সুস্পষ্ট লক্ষণ। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কেবল তারাই হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বা নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

তবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী হুসাইন বা অন্য কারও মৃত্যুতে মাতম করা জায়েজ নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মুসলিম জাতির একটি গোষ্ঠী হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র মৃত্যুতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***কোনো একজন বক্তাকে বলতে শুনেছি, কুফার উদ্দেশ্যে এবং ইয়াযীদের বিরুদ্ধে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বের হওয়া ন্যায় সংগত ছিল না। এ বিষয়ে সঠিক কথাটি জানতে চাই।***

ফাহাদ আহমেদ
চাঁনখারপুল, ঢাকা।

জবাব : বিজ্ঞ সাহাবীদের মতে কুফার উদ্দেশ্যে হুসাইনের বের হওয়াতে কল্যাণের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। এ জন্যই অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরত হননি। কুফায় যাওয়ার কারণেই ঐ সমস্ত জালেম ও স্বৈরাচারেরা রাসূলের দৌহিত্রকে শহীদ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার বের হওয়া এবং নিহত হওয়াতে যে পরিমাণ ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, মদিনায় অবস্থান করলে তা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহান আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও তকদীরের লিখন বাস্তবে পরিণত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না। হুসাইনের হত্যায় বিরাট বড় অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যা নয়। এর চেয়ে আরো ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। মহান আল্লাহর নবী ইয়াহ-ইয়া (আলাইহিস সালাম)-কে পাপিষ্ঠরা হত্যা করেছে। জাকারিয়া (আলাইহিস সালাম)-কেও তাঁর জাতির লোকেরা নির্মমভাবে শহীদ করেছে। এমনি আরও অনেক নবীকে বানী ইসরা-ঈলরা কতল করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তুমি তাদের বলে দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রাসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আবদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" *(সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৮৩)*

এমনিভাবে উমার, 'উসমান ও 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর হত্যাকাণ্ড নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কোনো যুক্তি নেই।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***আমরা আশুরার দিনে যে সিয়াম রাখি, সেটা হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই দিনে কারবালাতে শহীদ হওয়ার কারণে? না-কি হাদীসে এ দিন সিয়াম রাখার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে?***

আশরাফ উদ্দিন, পাটুয়াটোলি, ঢাকা।

জবাব : সুন্নি মুসলিমগণ এই দিনে রোযা রাখেন। কারণ এটি এমন একটি দিন যাতে আল্লাহ তা'আলা মূসা ও তাঁর জাতির লোকদেরকে ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরাউন সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং আশুরার সিয়ামের সাথে কারবালার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। কারবালার ঘটনা ঘটেছে ৬১ হিজরিতে। আর আশুরার সিয়াম চালু হয়ে তার বহু আগে। আর এই দিনে যেহেতু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাত বরণ করেছেন, তাই আমরা রোযা অবস্থায় হুসাইনের জন্য দু'আ করতে পারি। এর বেশি কিছু নয়।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***নামাযে চোখ বন্ধ রাখার হুকুম কী?***

নূর হোসেন
আগামাসিলেন, ঢাকা।

জবাব : নামায পড়ার সময় চোখ বন্ধ রাখা মাকরূহ। কেননা এ কাজ নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত বিরোধী। তবে এর যদি কোনো কারণ থাকে যেমন সম্মুখের দেয়াল বা বিছানায় এমন কারুকাজ বা চকচকে কিছু থাকে অথবা সম্মুখে প্রখর আলো থাকে যাতে চোখের ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তাহলে চোখ বন্ধ রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। মোটকথা কারণ বশত চোখ বন্ধ রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। বিনা কারণে তা মাকরূহ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)-এর যাদুল মা'আদ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***কেউ যদি আশঙ্কা করে যে, পেশাব-পায়খানা করতে গেলে জামা'আত ছুটে যাবে তাহলে জামা'আত ধরার জন্য কি সেটা আটকিয়ে রাখতে পারবে। না-কি জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও আগে পেশাব-পায়খানা শেষ করে নিবে?***

শরিফুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

জবাব : প্রথমে প্রকৃতির চাহিদা পূরণ করবে। অতঃপর ওযূ করে নামাযের দিকে অগ্রসর হবে। যদিও তার জামা'আত

ছুটে যায়। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এটা তার গ্রহণযোগ্য ওযর। নবী (ﷺ) বলেন,

«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

"খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু'টি নাপাক জিনিস আটকিয়ে রেখে কোনো নামায নেই।" *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : মাসাজিদ ও নামাযের স্থান, অনুচ্ছেদ : খাবার উপস্থিত হলে নামায পড়া মাকরূহ, হা. ৬৭/৫৬০)*

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***ফরয নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর করণীয় কি?***

ফারদিন খান, কলকাতা, ভারত।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা ফরয নামাযের পর তাঁর যিক্র করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾

"যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহর যিক্র করবে দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন অবস্থায়।" ***(সূরা আন্ নিসা : ১০৩)***

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে যিক্রের যেই আদেশ দিয়েছেন, নবী (ﷺ) তাঁর বাণীর মাধ্যমে সবিস্তারে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি সালাম ফিরানোর পর তিনবার ইস্তেগফার করবেন। অর্থাৎ- আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলবেন। এর আগে ১ বার আল্লাহু আকবার বলার ইঙ্গিত সহীহুল বুখারীতে পাওয়া যায়। অতঃপর একবার বলবেন,

«اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

"হে আল্লাহ! তুমিই সালাম (শান্তিময়)। তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আগমণ করে। তুমি সুমহান, সম্মানিত এবং মর্যাদাবান"- ***(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৫/৫৯১, ১৩৬/৫৯২)***। অতঃপর বলবেন,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ».

"একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ করো, তা দান করারও কেউ নেই। আর কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদা ও সম্পদশালীর সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না"। মহান আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা সম্ভব নয় এবং মহান আল্লাহর তাওফীক্ব ব্যতীত আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁরই 'ইবাদত করি। সকল নিয়ামত তাঁরই, সকল অনুগ্রহ তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো সত্য মা'বূদ নেই। তার নিমিত্তেই আমরা একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করি। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।" *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : আযান, অনুচ্ছেদ : ইমাম, মুসলিম মসজিদ, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ [রাযিয়াল্লাহু আনহু] থেকে উক্ত শব্দে হাদীসটি বর্ণিত, হা. ৮৪৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৯/৫৯৪)*

অতঃপর নবী করীম (ﷺ) থেকে যেসব তাসবীহ বর্ণিত হয়েছে, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। অর্থাৎ- ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ও ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে– ***(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : আযান)*** এবং একশ পূরণ করার জন্য এই দু'আটি বলবে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

"একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। মালিকানা তাঁরই সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।" ***(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : মসজিদ, হা. ১৩৭/৫৯৩, অতিরিক্ত অংশ)***

সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার এই বাক্যগুলো একসাথে মিলিয়ে ৩৩ বার বলতে অথবা প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ৩৩ বার করে বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সর্বাবস্থায় لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ একবার পড়ে সমাপ্ত করবে।

অনুরূপভাবে উপরোক্ত তাসবীহ্গুলো ৩৩ বারের পরিবর্তে ১০ বার করে বলাও জায়িয আছে।

প্রথমে দশবার সুবহানাল্লাহ্ বলবে, দশবার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং দশবার আল্লাহু আকবার বলবে। সবগুলো মিলে ৩০ বার হলো। এভাবে বলার কথাও সুন্নাত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : আদাব; জামে' আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : দু'আ)*

সুন্নাতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে ২৫বার সুবহানাল্লাহ্ পাঠ করবে, অতঃপর ২৫বার আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ করবে, অতঃপর ২৫বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে অতঃপর দশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। ২৫বার করে এই চারটি বাক্য পাঠ করা হবে। সবগুলো মিলে ১০০বার হলো।

উল্লেখিত তাসবীহ্গুলোর যে কোনো শ্রেণী দ্বারা পাঠ করলেই চলবে। কেননা ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি হচ্ছে, যেসব 'ইবাদতের বিভিন্ন পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রত্যেক পদ্ধতিই বাস্তবায়ন করা সুন্নাত। একবার এটি আরেকবার ওটি। যাতে করে মানুষ সমস্ত পদ্ধিতিতেই সুন্নাত পালন করতে পারে। যেসব যিক্রের কথা আমি বললাম, তা সকল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফজর, যোহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশা তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর ১০ বার لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পাঠ করবে। অনুরূপ উক্ত দুই নামাযের পর সাতবার رَبِّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ পাঠ করবে।

জিজ্ঞাসা (১৬) : নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কি ইমাম চলে যেতে পারেন? না-কি সামান্য সময় অপেক্ষা করবেন?

হানিফ খান
কক্সবাজার।

জবাব : সালাম ফিরানোর পর একবার আল্লাহু আকবার ও তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ বলতে যতটুকু সময় লাগে ইমামের জন্য সে পরিমাণ সময় কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা উত্তম। অতঃপর একবার اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ পাঠ করবেন। অতঃপর মুক্তাদীদের দিকে ফিরিয়ে বসবেন। *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : মাসজিদসমূহের বর্ণনা)*

ইমাম স্বীয় স্থানে বসে অপেক্ষা করা কিংবা উঠে যাওয়ার ব্যাপারে কথা হলো উঠে যেতে চাইলে যদি মুক্তাদীদের ঘাড় ডিঙিয়ে যেতে হয় তাহলে তার জন্য উত্তম হচ্ছে ভিড় কমার জন্য কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করা। ভিড় না থাকলে উঠে যেতে কোনো বাধা নেই।

মুক্তাদীর জন্যে উত্তম হচ্ছে তিনি যেন ইমামের আগে না উঠেন। কেননা নবী (ﷺ) বলেছেন, لاتسبقوني بالانصراف "তোমরা আমার আগেই উঠে যেও না"– *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সালাত)*। কিন্তু যে পরিমাণ সময় অপেক্ষা করা সুন্নাত ইমাম যদি কিবলামুখী হয়ে তার চেয়ে বেশি অপেক্ষা করেন, তাহলে মুক্তাদীর জন্য উঠে যেতে কোনো বাধা নেই।

জিজ্ঞাসা (১৭) : সুন্নাত সালাতে শেষের দুই রাকআতে সূরা আল ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে ভুলে গেলে কি সাহু সাজদাহ্ দিতে হবে? ইচ্ছাকৃতভাবে না মিলালে কি সালাত হবে?

আব্দুল্লাহ
মাদারিপুর।

জবাব : ফর্য কিংবা সুন্নাত সালাতে সূরা আল ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানোর ক্ষেত্রে আলেমদের দু'টি মত রয়েছে। এক মতে সূরা মিলানো ওয়াজিব। অন্য মতে ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত। দ্বিতীয় মতটিই অধিকাংশ আলেমের মত। সুতরাং ইচ্ছা করে কিংবা ভুলবশত সূরা মিলানো বাদ পড়লে সালাত হয়ে যাবে। *(দেখুন : শারহুল মুমতি- ৩/১০৩)*

জিজ্ঞাসা (১৮) : জামা'আতে সালাত আদায় করার সময় যারা পরে শরিক হয়েছে, তারা ইমামের দুই সালাম না এক সালাম দেওয়ার পরে তাদের ছুটে যাওয়া রাকআত পড়বে?

মোকাম্মাল
বরুয়াল, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : যারা সালাতের দুই/এক রাকআত চলে যাওয়ার পর ইমামের সাথে শরীক হয়েছে, তারা ইমামের দুই দিকে সালাম ফেরানোর পর দাঁড়াবে এবং বাকী সালাত পূর্ণ করবে। এটাই অধিকাংশ আলেমের মত। এতেই রয়েছে অধিকতর সতর্কতা।

জিজ্ঞাসা (১৯) : আমি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এবং প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যাই, সেখানে দুই দিন থাকি, এখন আমি সালাত কিভাবে আদায় করবো?

সিয়াম শিকদার
চিতলমারি, বাগেরহাট।

জবাব : আপনি আপনার নিজ বাড়িতে সালাত কসর করতে পারবেন না। যদিও আপনি সেখানে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন বা একদিন থাকেন। কারণ এটা আপনার অস্থায়ী বাসস্থান নয়। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

নান্দনিক স্থাপনা মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার

–আবূ ফাইয়ায

মাসজিদুল হারামের অতি নিকটে আকর্ষণীয়, চিত্তগ্রাহী ও দৃষ্টিনন্দন যে টাওয়ারটি আকাশের বুক চিরে দাঁড়িয়ে আছে সে টাওয়ারটির নাম হলো আবরাজ আল-বাইত টাওয়ার, যা মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ার নামেও পরিচিত। এটি পবিত্র কা'বা ঘরের দক্ষিণ প্রবেশ পথ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত ৯৫ তলা বিশিষ্ট ১৯৭২ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন একটি টাওয়ার। মক্কা রয়েল ক্লক টাওয়ারটি পৃথিবীর অন্যতম নান্দনিক স্থাপনা। মক্কা টাওয়ারের সামনে গেলেই মানুষ বিমোহিত নয়নে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এ টাওয়ারটির দিকে। উচ্চতায় ৬০১ মিটার ও ৯৫ তলা বিশিষ্ট এ টাওয়ারটি বর্তমানে পৃথিবীর তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থাপনা। ১ লাখ মানুষের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই টাওয়ারে আছে একটি বিশাল প্রার্থনা কক্ষ, এখানে একসাথে ১০ হাজার মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারেন।

মক্কা রয়েল টাওয়ারে আছে সেভেন স্টার হোটেল, সুবিশাল শপিং মল এবং এর নীচে একসাথে ১০ হাজার গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। টাওয়ারের সবচেয়ে উপর তলায় দুটি হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য রয়েছে প্রশস্ত হেলিপ্যাড। এখানে আরো আছে চাঁদ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, মুসলিম ঐতিহ্য সংরক্ষণে জাদুঘর এবং হজ্জ ও উমরাহ পালনকারীদের জন্য ৩ হাজার অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কক্ষ। টাওয়ারের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে লাউড স্পীকার। এ লাউড স্পীকার থেকে ৭ কি.মি. পর্যন্ত আযান ও তিলাওয়াত শোনা যায়।

সাতটি বড় বড় টাওয়ারের সমন্বয়ে গঠিত মক্কা রয়েল টাওয়ারের শীর্ষে স্থাপন করা হয়েছে একটি রাজকীয় ঘড়ি। এ ঘড়িটি বিশ্বের সবচেয় বড় ঘড়ি। তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে সেবাহির মলে যে ঘড়িটি আছে আয়তনের দিক দিয়ে এটিই ছিল এতদিন বিশ্বের বৃহত্তম ঘড়ি, যার ডায়াল ছিল ৩৬ মিটার চওড়া। কিন্তু মক্কা ঘড়ির ডায়াল ৪৩ মিটার, যা লন্ডনের বিগবনের ঘড়ির ডায়ালের চেয়ে ৬ গুণ বড়। ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্মিত চতুর্মুখী ঘড়িটির এক মুখে লাগানো হয়েছে ৯ কোটি ৮০ লাখ পিস গ্লাস মোজাইক। শিলালিপির উপর শৈল্পিক কারুকার্যে অলঙ্করণ করে আররীতে লেখা আছে 'আল্লাহু আকবর' শব্দগুচ্ছ, যা ২১০০০ রঙিন বিজলি বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বড় অক্ষরে আল্লাহু আকবর লেখাটি ৩০ কি.মি. দূর থেকে পড়া যায় এবং ঘড়ির টাইম গণনা করা যায়।

আল্লাহু আকবার শব্দের উপরের দিকে ৫৯০ মিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হয়েছে সোনা দিয়ে মোড়ানো ৭৫ ফুট ডায়ামিটারের একটি বাঁকা চাঁদ। স্বর্ণালী মোজাইক ও ফাইবার গ্লাসের তৈরি এই চাঁদটির ওজন ৩৫ টন। বিশেষ বিশেষ দিনে এবং সালাতের সময় এই চাঁদ থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ বা ফ্ল্যাশ সংকেত দৃশ্যমান হতে থাকে। আলোর এই বিকিরণ আকাশের দিকে ১০ কি.মি. পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।। প্রায় ২০ লাখ LED বাতি মহান আল্লাহর নামকে প্রোজ্জ্বল করে রাখে রাতভর। সে আলোয় উদ্ভাসিত ও প্রতিভাত হয়ে ওঠে পবিত্র মক্কা নগরী ও তার আকাশ। ঢেউ তোলে নয়নাভিরাম ও দৃষ্টিনন্দন এক আলোর ঝলকানি। যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মক্কা টাওয়ারের ঘড়ি স্থাপনের পেছনে অনেক কারণ ক্রিয়াশীল। ১২৬ বছরের পুরনো গ্রিনিচমান সময় পরিবর্তন করে মক্কার সময় চালু করা যাবে বলে অনেকে মনে করেন। ২০০৮ সালে কাতারের রাজধানী দোহাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে মুসলিম বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করে বলেন, পৃথিবীর মধ্যম রেখা পবিত্র মক্কার উপর দিয়ে প্রলম্বিত, ফলে মক্কা পৃথিবীর টাইম জোনের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া মক্কা আন্তর্জাতিক ধর্মীয় ও বাণিজ্য নগরী।

গ্রিনিচ মান সময় বা গ্রিনিচ মান টাইম (GMT)-এর বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়েছে 'মক্কা মান সময়' বা Mecca Mean Time (MMT)। সারাবিশ্বের সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে গ্রিনিচ মান সময় অনুসরণে। তবে গ্রিনিচ মানের দিন এখন শেষ হয়ে আসছে বলা যায়। কারণ দিন এসেছে মক্কা মান সময়ের। পৃথিবীর সময় নির্ধারক ঘড়িকে অতিক্রম করে মক্কায় অবস্থিত মক্কা ক্লক এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ঘড়ি। পৃথিবীর বৃহত্তম এ ঘড়িটি আরব সময়সূচী অনুযায়ী চলে, যা গ্রিনিচ সময় থেকে তিন ঘণ্টা এগিয়ে।

৮০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত ক্লক টাওয়ারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০০৪ সালে এবং উদ্বোধন করা ২০১১ সালে। পুরো টাওয়ার নির্মাণের মূল দায়িত্বে ছিল সৌদি আরবের বিখ্যাত বিন লাদেন গ্রুপ। আর্কিটেকচারাল, স্ট্রাকচারসহ যাবতীয় ডিজাইন এবং সুপারভিশন এর কাজ করেছে প্রখ্যাত দার আল হানদাশাহ গ্রুপ। ডিজাইন করেছে সুইস ও জার্মানির প্রকৌশলীরা। ঘড়িটির প্রস্তুতকারক বিশ্বখ্যাত জার্মানির এসএল রাশ কোম্পানী। *[সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক যুগান্তর, আমিরাত সংবাদ, নবধারানিউজ.নেট- ইন্টারনেট]*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুলাই-২০২৪)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৩	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৪	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৫	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৬	০৩ : ৫১	০৫ : ১৬	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৮	০৩ : ৫২	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৯	০৩ : ৫২	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
১০	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
১১	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১২	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৩	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৪	০৩ : ৫৫	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৫৬	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৬	০৩ : ৫৬	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৭	০৩ : ৫৭	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৯	০৩ : ৫৮	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২০	০৩ : ৫৯	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২১	০৩ : ৫৯	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১১
২২	০৪ : ০০	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১১
২৩	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৬	০৮ : ১০
২৪	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৫	০৪ : ০২	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৬	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৮
২৭	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৮	০৪ : ০৪	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৯	০৪ : ০৫	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৬
৩০	০৪ : ০৫	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৫
৩১	০৪ : ০৬	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪২	০৮ : ০৫

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

ভর্তি চলছে

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

অনার্স প্রোগ্রাম

মেধাবৃত্তির সুবিধা

- B.A in Al Quran and Islamic Studies
- B.Sc in Computer Science & Engineering
- B.Sc in Electrical & Electronic Engineering
- Bachelor of Business Administration

মাস্টার্স প্রোগ্রাম

- M.A in Al Quran and Islamic Studies
- Master of Business Administration

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমন্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরী
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)

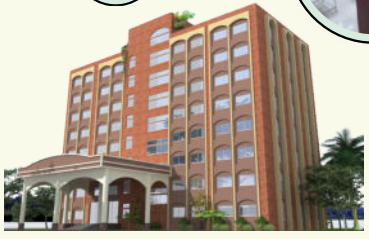

নিজস্ব খেলার মাঠ

01329-728375-78 www.iiustb.ac.bd info@iiustb.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস : বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত